মহারাণী

মহারাণী

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)



ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৬৪

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত। শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রচ্ছদপট চিত্রিত।




এক

মহারাণী ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ একটু বিব্রত বোধ করলেন। যদিও তিনি জমিদার বাড়ির বেতনভুক ভৃত্য নন তবু তাঁকে যেতে হবে। বেতনভুক ভৃত্যেরা মাঝে মাঝে মনিবের আদেশ অমান্য করে, কিন্তু কাব্যতীর্থের তা করবার উপায় নেই, তাঁকে যেতেই হবে, কারণ তিনি মনে মনে জানেন যে মহারাণীর কেনা গোলাম তিনি। দাসখৎটা তিনি কবে লিখে দিয়েছিলেন, কেন লিখে দিয়েছিলেন, কি শর্তে বা কি মূল্যের পরিবর্তে লিখে দিয়েছিলেন তা কেবল তিনিই জানেন। অনেকদিন আগে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, যার কথা বাইরের লোকে ঘুণাক্ষরেও জানে না, যা উপেক্ষা করলে কোনও ক্ষতি নেই, তা শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে আজও দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মহারাণী ডাকলে তাঁকে যেতেই হবে, তিনি না গিয়ে পারেন না।

নটবর চাকর ডাকতে এসেছিল। তাকে তিনি বললেন, "তুমি যাও, আমি আসছি একটু পরে।"

নটবর চলে যাবার পর দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আর একটু বিব্রত হলেন তিনি। প্রথম, এই ঠাণ্ডায় স্নান করতে হবে। মহারাণীর কাছে অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া যায় না। অনেকদিন আগে একবার স্নান না ক'রে মহারাণীর কাছে তিনি গিয়েছিলেন। মহারাণী তাঁর দিকে একনজর চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "তোমার অভ্যন্তরটা খুব শুচি তা আমি জানি, কিন্তু বাইরেটা তা ব'লে অপরিষ্কার থাকাটা কি ভালো? ব্রাহ্মণের তো বাহ্যোভ্যন্তর শুচি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় শুনেছি!" এর পর থেকে অস্নাত অবস্থায় মহারাণীর

সম্মুখীন হতে সাহস করেননি তিনি কখনও। সুতরাং যদিও তাঁর বাতের ব্যথাটা বেড়েছে তবু ওই ঠাণ্ডা পুকুরের জলেই অন্তত একটা ডুব দিয়ে নিতে হবে তাঁকে। দ্বিতীয় সমস্যা, গৃহিণী। তিনি যেই শুনবেন মহারাণীর দরবারে ডাক পড়েছে অমনি তাঁর মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসবে। অথচ আসা উচিত নয়। ওই মহারাণীর দৌলতেই যে তাঁদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলছে একথা কে না জানে। অবশ্য, তিনি যে ব্রহ্মত্র ভোগ করছেন তা গালুটির জমিদারবাবুরা দিয়েছেন, কিন্তু মহারাণীর ইঙ্গিতেই যে দিয়েছেন একথা মহারাণী গোপন রাখতে চাইলেও গোপন থাকেনি, অন্তত তাঁর কাছে থাকেনি। গালুটি স্টেটের ম্যানেজার কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। তাঁর গৃহিণী সর্বমঙ্গলাও কথাটা জানেন। সর্বমঙ্গলাকে কত উপহারও দিয়েছে মহারাণী। সর্বদা উপকার করবার জন্য ব্যস্ত। আইনত সর্বমঙ্গলার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু মহারাণীর নাম শুনলেই তাঁর মুখ ভার হয়ে ওঠে। শ্রীহর্ষ মাঝে মাঝে ভেবেছেন মহারাণী নিজেই অনায়াসে তাঁকে একশ' বিঘে জমি দিতে পারত, গালুটির বাবুদের জমিদারির তিনগুণ জমিদারি তার, কিন্তু, সে তা দেয়নি! কেন দেয়নি? তার সঙ্গে সম্পর্কটা যাতে অনুগ্রহের ছোঁয়াচ লেগে মলিন না হয়ে যায় সেইজন্য? কিন্তু অনুগ্রহই তো করেছেন, সেটা না হয় বর্ষিত হয়েছে গালুটির বড়বাবু মহেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে। এভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কি দরকার ছিল, মাঝে মাঝে একথা ভাবেন শ্রীহর্ষ। মহেন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন একথা। কিন্তু বহুকাল পূর্বের কথা এসব, বিস্মৃতির তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত আছে মহারাণীর চরিত্রের রহস্য। সে রহস্য আজও [illegible] কাছে রহস্যই থেকে গেছে, হয়তো আপনাদের কাছেও থাকবে। কিন্তু তার আভাস পেতে হলেও আগের ঘটনা-পরম্পরা জানা চাই। সেইগুলোই আগে বলি। শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ ততক্ষণ স্নান ক'রে তৈরি হোন।

দুই

একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, গল্পটি একালের নয়, সেকালের। সিপাহী-বিদ্রোহ তখন সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জের তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটেনি। জনসাধারণের মতামত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের মতে সিপাহীরা বীর, ওরা ইংরেজদের উচ্ছেদ ক'রে দেশে স্বাধীনতা আনতে চায়। আর ধারণা স্বাধীনতার ব্যাপারটা ছুতো, হয়তো দু'একজনের আদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই ডাকাত। দেশকে ক'রে দিয়ে লুটতরাজ করাই ওদের উদ্দেশ্য, মাৎস্যন্যায়ের বার যেমন হয়েছিল। মহারাণীর বাবা সমুদ্রবিলাস চৌধুরী দ্বিতীয় দলের লোক। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল দেশী লোক বার যদি শাসনভার ফিরে আসে তাহলে ভদ্রলোকদের আর অন্ত থাকবে না। তাই এই ব্যাপারে তিনি ইংরেজদের করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যারা ইংরেজদের সাহায্য তাদের যথাসাধ্য শাসনও করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে যায় বিশ্বদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পলাতক বিদ্রো- সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে' তাকে সপরিবারে নিজের জমিদারি থেকে উৎখাত করেছিলেন তিনি। সাহেবদের ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছিলেন তার পিছনে। গোরার গুলিতে বিশ্বদেবের বড় ছেলে সূর্যদেব মারা যায়। তার স্ত্রীকেও নাকি গোরারা ধর্ষণ করেছিল। বিশ্বদেব ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কথিত আছে সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমুদ্রবিলাসের নাকি পুত্রসন্তান হয়নি। বিশ্বদেব অভিশাপ দিয়েছিল চৌধুরীবংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। মহারাণীর

জন্মের পরই মহারাণীর মা মারা গেলেন। সমুদ্রবিলাস আরও দুবার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু আর কোনও সন্তান হয়নি। সেকালের এক সাহেব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন, সন্তানের জন্য আপনি আর বিয়ে করবেন না, কারণ আপনার আর সন্তান হবে না। তিনি এর কারণ নির্ণয় করেছিলেন গণোরিয়া। তাঁর ছোট ভাই পান্নুবাবু (পুরো নাম, পর্বতবিলাস) বিয়েই করেননি। সাহেব ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করেননি তিনি, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ব্রহ্মশাপে। তিনি বলতেন, গণোরিয়া কার নেই, ভদ্রলোক মাত্রেরই আছে, সেটা বংশলোপের কারণ হ'লে এদেশে কারও বংশ থাকত না। ওটা কারণ নয়, উপলক্ষ্য। এই ব'লে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক বলতেন—

সুখান্তে শুষ্কিতা গাভী, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিত
যশান্তে চপলা ভার্যা, কুলান্তে বৈরী ব্রাহ্মণঃ।

সুখের দিন যখন শেষ হয় তখন গাইয়ের দুধ শুকিয়ে যায়, দুঃখের অন্ত হয় পুত্র পণ্ডিত হ'লে। ভার্যা চপলা হ'লে মানুষের সুনাম নষ্ট হয়, আর কুল নষ্ট হয় ব্রহ্মশাপে। আমাদের ব্রহ্মশাপ লেগেছে। সুতরাং বিয়ে ক'রে আর ভদ্রকন্যাদের বিপন্ন করার দরকার কি। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। আমরণ কুমার থেকে তাই করেছিলেন তিনি। জপ তপ নিয়েই থাকতেন। এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। লোকে বলত তিনি শব-সাধনাও করেছেন। আর একটা কাজও করতেন তিনি, বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাতেন। পর্বতবিলাস নামের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এ ঝোঁক হয়েছিল, না, পর্বতের নির্জনতায় জপ তপ করবার সুবিধে হবে বলেই তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতেন, তা কেউ জানে না।

সমুদ্রবিলাস যখন মারা গেলেন তখন মহারাণীর বয়স ষোলো। সেকালের নিয়ম অনুসারে ন'বছর বয়স থেকেই মহারাণীকে কোনও

সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। প্রথমত, পাত্র নির্বাচন ব্যাপারে অনেকদিন মনঃস্থির করতে পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দুটি পাত্রকে তিনি নির্বাচন করেন। প্রথম পাত্রটি গ্রামেরই। তাঁর বাল্যবন্ধু ভবভূতি ভট্টাচার্যের একমাত্র পুত্র শ্রীহর্ষ। ভালো বংশ, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে নিখুঁত, লেখাপড়ায় তীক্ষ্ণধী, আচার ব্যবহারে বিনয়ী, জামাই করবার মতো ছেলে। মহারাণীর ছেলে-বেলার সঙ্গীও। বাল্যবন্ধুর ছেলে ব'লে বাড়িতে তার অবাধ গতি-বিধি ছিল। সুতরাং তাঁর এটা ভাবা অন্যায় হয়নি যে শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে মহারাণীর আনন্দই হবে। তাছাড়া মনে মনে সমুদ্রবিলাসের আর একটা মতলব ছিল—শ্রীহর্ষকে শেষ পর্যন্ত ঘরজামাই করা। ভবভূতি ভট্টাচার্যের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এত বড় জমিদারের একমাত্র মেয়েকে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত মর্যাদায় রাখবার সামর্থ্য যে তাঁর নেই, একথা সমুবাবু জানতেন। কিন্তু তাঁর ওই মতলবটি ছিল ব'লে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। ভবভূতির কাছে এ প্রস্তাব করতে তিনি খোলাখুলি-ভাবে যা বললেন তাতে একটু দ'মে গেলেন সমুদ্রবিলাস। কথাটা শুনে ভবভূতি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, "দেখ ভাই, আমি হেলে সাপ, বড় জোর একটা ব্যাঙ গিলতে পারি, কিন্তু হাতী গিলবার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি বাল্যবন্ধু, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে আমি সুখীই হতাম,—কিন্তু—"

এই কিন্তুর জটটা খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সমুদ্রবিলাস। কিন্তু খোলেনি। অতি সাবধানে ইঙ্গিতটা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। হেসে বললেন, "আমার মেয়ে জামাইই তো বিষয়ের মালিক হবে শেষ পর্যন্ত। অভাব তোমাদের থাকবে না।"

ভবভূতিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

"সেটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধ

আহ্লাদ আছে তো। আমিও তো পুত্রবধূ নিয়ে ঘর করতে চাই। তোমার মহারাণী পুকুর থেকে জলও আনতে পারবে না, আমাকে দু'মুঠো রান্না করেও দিতে পারবে না, গরুর জাবও দিতে পারবে না। শ্রীহর্ষের মা সারাজীবন ওই কাজ করেছে, এখনও করছে। আমার ইচ্ছে শ্রীহর্ষের বউ এসে এবার ওর হাত থেকে সংসারের ভার নিক। তোমার মহারাণী হয়তো সে ভার নিতে চাইবে, অন্তত চেষ্টা করবে, ও মেয়ে খুব ভালো, কিন্তু ও পারবে না। ও ময়ূরকে নাচাতে পারবে, কিন্তু বাসন মাজতে পারবে না। আমি ওকে দেখছি তো। আমাদের ঘরে ওসব মেয়ে বেমানান। তুমি বরং গালুটির বড়বাবুর বড় ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে দেখ না। মহেন্দ্র ছেলে ভাল—"

"সে কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে মেয়ে আমার ঘরেই থাকত। তাছাড়া শ্রীহর্ষকে আমার বেশী পছন্দ। তুমি তোমার যে সাধ আহ্লাদের কথা বললে তার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হবে না। তোমার বা তোমার স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে রাঁধুনী, ঝি, চাকর রেখে দিতে পারি। পাঁচার মা তো সঙ্গে যাবেই। মহারাণীকে ও মানুষ করেছে, ওকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না।"

ভবভূতি ভট্টাচার্য মাথা হেঁট ক'রে নিজের প্রশস্ত টাকে বার কয়েক হাত বুলিয়ে শেষে বললেন, "আমি সাধ আহ্লাদ বলতে যা বুঝি, তা তোমার ঝি-চাকর দিয়ে মিটতে পারে না কখনও। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে আমার—"

আবার টাকে হাত বুলোলেন তিনি।

"কি কথা ?"

"এটা ঠিক যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করলে তার ভবিষ্যতের ভাবনা আর থাকবে না। নিজের সাধ-আহ্লাদের জন্য তার এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করাটা ঘোর স্বার্থপরতা হবে বোধহয়। হঠাৎ মনে

হ'ল কথাটা। ভেবে দেখি। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, শ্রীহর্ষকেই জিগ্যেস কর। সে যদি আপত্তি না করে আমি আর আপত্তি করব না।"

"বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মত নেওয়াটা—"

সমুদ্রবিলাস বাক্যটি শেষ করলেন না, কিন্তু তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হ'ল না ভবভূতির। তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ভবভূতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ক্ষতি কি—"

বলেই উঠে গেলেন তিনি।

সমুদ্রবিলাস নিজে কিন্তু কথাটা বলতে পারেননি শ্রীহর্ষকে। তিনি অনুরোধ করলেন প্রিয় বয়স্য রসরাজকে, তিনি যেন কথাটা পাড়েন তার কাছে। সেকালে বড় বড় জমিদারদের দরবারে 'বয়স্য' নামধেয় যে সব পার্শ্বচরেরা থাকতেন তাঁরা সবাই নিছক চাটুকারই ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু ছিলেন, সুরসিকও হতেন অনেকে। তাঁরা জমিদারদের অনুগৃহীত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁরাই একমাত্র লোক ছিলেন যাঁরা জমিদারদের মুখের উপর স্পষ্ট কথা শোনাতে পারতেন।

অনুরোধটি শুনে রসরাজ বললেন, "দেখুন হুজুর, আমি পাচন খেলে যদি আপনার হজম শক্তি বাড়ত তাহলে তা আমি খেতাম, তেতো হলেও খেতাম। কিন্তু ভব পুরুতের ছেলের কাছে এ প্রস্তাবটি করলে আপনার মান বাড়বে না, আমারও মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তবে আপনার যখন হুকুম, তখন খবরটা আমি জোগাড় করে দেব।"

তিনি ভার দিলেন হীরু নাপিতকে। সমাজের সর্বস্তরে হীরু নাপিতের যাতায়াত। কিন্তু মনোমত ফল ফলল না। হীরু নাপিত যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে এবং যে পরিবেশে সংবাদটা শ্রীহর্ষকে বলল তা একটু অন্যরকম হ'লে কি হ'ত বলা যায় না।

একদিন হাটের মাঝখানে একমুখ হেসে শ্রীহর্ষকে সম্বোধন ক'রে হীরু বলে বসল—"ও দাদাঠাকুর, শোন, শোন, তোমার বরাত যে ফিরে গেল গো—"

শ্রীহর্ষের বয়স তখন বছর কুড়ি। আসন্ন যৌবনের ঈষৎ উদ্ধত দীপ্ত শ্রী চোখে মুখে। টোলে মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর খাতির ছিল এবং তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা নিরঞ্জনের ঈর্ষ্যাও ছিল তাঁর উপর সেই জন্য। শুধু সেই জন্য নয় সমুদ্রবিলাসদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতাও ইন্ধন জুগিয়েছিল সে ঈর্ষ্যার আগুনে।

শ্রীহর্ষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "বরাত ফিরে গেল? কি রকম?"

"রাজাবাহাদুর তোমাকে ঘরজামাই করতে চাইছেন যে গো। ভারী মনে ধরেছে তোমাকে—। তখন যেন এই গরীব হীরুকে ভুলে যেওনি।"

নিরঞ্জন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হো হো করে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল সে।

"এ আর নতুন কথা কি শোনালে, হীরু। এ তো আমরা জানতামই যে মধুসূদন শেষকালে 'মোধো' হবে। আসল খবরটাই তো তুমি বললে না, মনে ধরেছে কার, রাজাবাহাদুরের, না আর কারও—"

শ্রীহর্ষের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, তারপর চোখ দিয়ে ছুটে বেরুল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্থিরকণ্ঠে কিন্তু উত্তর দিলেন তিনি।

"কারো ঘরজামাই আমি হব না"—বলেই সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থেমে যেতে হ'ল তাঁকে। ব্যাপারটার অন্য দিকটা চোখে পড়ল। ঘরজামাই না হ'লে যে মহারাণী চিরকালের মতো অপরের হয়ে যাবে। তখন একবার দেখাও যে হবে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সোজা মহারাণীর কাছে গেলেন। দেউড়ি পেরিয়ে বৈঠকখানা মহল, সেখানে ঘোর রবে পাশা খেলা চলছিল। বৈঠকখানা মহল পার হয়ে বিশাল প্রাঙ্গন, তার একদিকে নাট-

মন্দির আর একদিকে সারি সারি তিনটি মন্দির—কালীর, সিংহবাহিনীর এবং দুর্গার, পশ্চিম প্রান্তে বিরাট অতিথিশালা। তারপর ফুলের বাগান। ফুলের বাগান পেরিয়ে তবে অন্দরমহল সে-ও বিরাট। আগেই বলেছি অন্দরমহলে শ্রীহর্ষের অবাধ গতি ছিল, যদিও সেটা অনেকে সুদৃষ্টিতে দেখত না। বিশেষ ক'রে মেয়েরা, মেয়েরও অভাব ছিল না। আত্মীয় স্বজনদের বহু পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল সমুদ্রবিলাসের অন্দরমহলে। একপাল পায়রার মতো দিনরাত বক্‌বকম্ করত তারা।

তাঁদেরই একজন, শান্ত পিসি, শ্রীহর্ষের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আজ এমন অসময়ে যে ?"

"মহারাণীর সঙ্গে দরকার আছে একটু। সে কোথা ?"

"সে খিড়কির বাগানে আছে বোধহয় কোথাও। অনেকক্ষণ দেখিনি—"

খিড়কির বাগানের দিকে শ্রীহর্ষ যখন চলে গেলেন তখন শান্ত পিসি তাঁর দেখন-হাসির দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "মরণ আর কি ! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছে ছোঁড়া—"

শান্ত পিসির দেখন-হাসি শুকী (শুকতারা) সমুদ্রবিলাসের অনুগৃহীতা ছিলেন। কোন্ আইন অনুসারে তিনি সমুদ্রবিলাসকে ঠাকুরপো বলতেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ। তাঁর রূপ ছিল এবং সেইটেই সম্ভবত ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, "আসল খবরটি তুমি জান না দেখছি, তাই উল্টো উপমা দিয়ে বসলে। শ্রীহর্ষই চাঁদ, আমাদের দুলালী হয়তো সে চাঁদের রোহিনী হবে। ঠাকুরপো শুনছি বিয়ের কথা পেড়েছেন।"

সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় গৃহিণীর দূর সম্পর্কের মাসী, থলথলে মোটা আর কুচকুচে কালো, কাত্যায়নী বসে ছিলেন কাছে। এ সংবাদ শুনে গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ ক'রে বললেন, "তাই এত বাড়

বেড়েছে আজকাল।" অনেকেই কিছু একটা সন্দেহ করছিল অনেক দিন থেকে। দেখন-হাসির মুখে এ সংবাদ শুনে ঘসা কাচটা স্বচ্ছ হয়ে গেল হঠাৎ যেন।

খিড়কির বাগান ছোটখাটো বাগান নয়! প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমির উপর তা বিস্তৃত। ফুলের গাছ তো আছেই, ছোটখাটো পুকুরও আছে একটা। সেই পুকুর ধারে গন্ধরাজের ঝোপের আড়ালে মহারাণীকে দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষকে দেখেই ছুটে এল সে, আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত।

"কার্তিককে রঘু পিঠে চড়তে দিয়েছে, দেখবে এস। শিগ্‌গির এস, এখুনি নেবে পালাবে।"

কার্তিক মহারাণীর পোষা বাঁদর, আর রঘু পোষা ময়ূর।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন সত্যিই কার্তিককে পিঠে নিয়ে রঘু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "কম বেগ পেতে হয়েছে এজন্যে আমাকে—"

এইটেই মহারাণীর বৈশিষ্ট্য। সাধারণত যা সম্ভব হয় না, সাধারণত যা কেউ করে না তাই করবার দিকেই ওর ঝোঁক বেশী। ও উচ্ছের পায়েস বানিয়েছে, বট গাছকে ছোট মাটির টবে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাঘের বাচ্ছা আর গরুর বাচ্ছাকে জল খাইয়েছে একঘাটে, অবশ্য দুটোই পোষা। যে বেদের কাছ থেকে মহারাণী বাঁদরটা কিনেছিল সেই ওর নাম রেখেছিল কার্তিক। নাম শুনেই মহারাণীর খেয়াল হ'ল ময়ূরের পিঠে ওকে চড়াতে হবে। কাজটা দুঃসাধ্য। কার্তিক রঘু দুজনেই এতে নারাজ। কিন্তু মহারাণীর জেদও কম নয়, কলা-কৌশলও নানারকম। অনুরোধ উপরোধ যখন ব্যর্থ হ'ল তখন শুরু হ'ল জবরদস্তি। রঘুর পা ডানা বেঁধে কার্তিককে জোর ক'রে চড়িয়ে দেওয়া হ'ত তার পিঠে, কার্তিকেরও হাত পা বাঁধা। পিঠের সঙ্গে বেঁধেই দেওয়া হ'ত তাকে। কিছুদিন এই ভাবে চলবার পর রঘু আর কার্তিক দুজনেই বুঝল যে তাদের আপত্তি আর টিকছে

না। মনিবটি বড্ড বেশী রকম জেদী। কার্তিক এও অনুভব করল রঘুর পিঠ চড়তে খুব খারাপও লাগে না, বরং গাছের ডালের চেয়ে ওর পিঠ বেশী মোলায়েম। রঘুও দেখলে খারাপ একটু লাগছে বটে কিন্তু যত খারাপ লাগবে আশঙ্কা হয়েছিল তত খারাপ নয়, তাছাড়া মনিবের যখন অত ইচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কার্তিককে পিঠে চড়তে দিয়েছিল সে। রঘু দুর্দমনীয় পুরুষ ময়ুর। বাগানের সমস্ত সাপ ধ্বংস করেছিল, বিশ্বম্ভর ষাঁড়টা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। একদিন তার পিঠে চড়ে মাথার ঠিক মাঝখানটিতে এমন ঠোকর দিয়েছিল যে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়েছিল তাকে। মহারাণী ওর রঘু নাম রেখেছিল শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, রঘু ডাকাতকে স্মরণ ক'রে। এই রঘুর পিঠে কার্তিককে চড়ানো কম কৃতিত্বের কথা নয়। শ্রীহর্ষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ময়ূরবাহন কার্তিকের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহারাণী ছাড়া এ আর কেউ পারত না, মনে হ'ল তাঁর।

"অসাধ্য সাধন করেছ সত্যি"—তারপর একটু থেমে একটু ইতস্তত ক'রে নিজের কথাটা পাড়লেন।

"কিন্তু আমি যে একটা মুশকিলে পড়ে গেছি, সেটার কিছু করতে পার—?"

"কিসের মুশকিল ?"

শ্রীহর্ষ সব খুলে বললেন। শুনে মহারাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল সে।

"হাসছ যে ?"

"এতে আর মুশকিলটা কি। ঘরজামাই হ'তে না চাও, হয়ো না।"

"কিন্তু—"

ইতস্তত করে থেমে গেলেন শ্রীহর্ষ। বলতে পারলেন না যে যদিও তিনি ঘরজামাই হ'তে রাজি নন কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে হ'লে

মহারাণী যে চিরকালের মতো অপরের হয়ে যাবে এই নিদারুণ সত্যের সঙ্গেও আপোষ করতে রাজি নন তিনি। কিন্তু এত কথা তাঁর মুখ দিয়ে সেদিন বেরুল না! দু'জনের ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে কেটেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে থকেতে পারবে না এ কথা কারও অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কেতাবী ভাষায় যাকে প্রেমালাপ বলে তা কোনওদিন হয়নি তাদের মধ্যে।

মহারাণী হাসিমুখে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে।

"কিন্তু কি ?"

যে কথাটা স্পষ্টভাবে অকপটে বললে সমস্যাটার জট খুলে যেত, সে কথাটা কিন্তু শ্রীহর্ষ বললেন না, বলতে পারলেন না। সমস্যাটার অপর দিকটা উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস পেলেন বরং।

"আজ প্রস্তাবটা হীরু নাপিতের মারফত এসেছে, কিন্তু কাল যদি তোমার বাবা নিজেই এ কথা আমাকে বলেন তখন কি ক'রে আমি তাঁর মুখের উপর 'না' বলব ?"

"বোলো না, চুপ ক'রে থেকো—"

এর বেশী আর কাথাটা এগোয়নি সেদিন। মহারাণীর অন্যমনস্কতার সুযোগে কার্তিক রঘুর পিঠ থেকে নেবে পালিয়েছিল আর রঘু পেখম মেলে নাচছিল তার নবাগতা প্রেয়সী ময়ূরীটির সামনে। মহারাণী তার নাম রেখেছিল নবমী, কারণ এর আগে আরও আটজন এসেছিল।

"নবমীকে দেখলেই রঘু নাচে আজকাল। ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না—"

এরপরই পোকা-ওলা জিতু এসে পড়ল পাখীদের খাওয়াবার জন্য। মহারাণীর পশু-পাখী পোষবার খুব শখ। পাখী তো নানারকম ছিলই, পশুও ছিল অনেক রকম, সিংহ, বাঘ, শেয়াল এমন কি উদ্‌বেরাল, সজারু পর্যন্ত। পোকা-ওলা জিতু ওস্তাদ ছিল এসব বিষয়ে। এর জন্য নিষ্কর জমি ভোগ করত সে অনেকখানি। জিতু

এসে পড়াতে কথাটা আর এগোল না। সমস্যার সমাধান হ'ল না। একটু পরে চলে আসতে হ'ল শ্রীহর্ষকে।

সমুদ্রবিলাস পরদিনই খবর পেলেন রসরাজের কাছ থেকে। রসরাজ রসিকতা ক'রে বললেন, "হুজুর, শৃগালটি মলত্যাগ করবার জন্য পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। হীরু নাপিতকে দিয়ে পেড়েছিলাম কথাটা, হীরু বললে তিনি শৃঙ্গ থেকে নামবেন না। হ'ল ত ?"
কথাটা শুনে হঠাৎ রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল সমুদ্রবিলাসের। ওইটুকু ছেলের এত বড় স্পর্ধা! ডেকে পাঠালেন তাঁকে। সমুদ্রবিলাসের সম্মুখীন হয়ে শ্রীহর্ষ কিন্তু নিজের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারলেন না। বাল্যকাল থেকে যাঁকে সম্ভ্রম ক'রে এসেছেন, যিনি পিতৃবন্ধু, যিনি মহারাণীর বাবা তাঁর মুখের উপর তিনি বলতে পারলেন না যে আমি মহারাণীকে বিয়ে ক'রে আপনার ঘর-জামাই হ'তে পারব না। মহারাণীকে পাওয়ার জন্যে তার সমস্ত সত্তা বহুদিন থেকে উন্মুক্ত হয়েই ছিল, হাটের মাঝখানে, বিশেষত জ্ঞাতি-শত্রু নিরঞ্জনের সামনে হীরু কথাটা অমন বিশ্রীভাবে পেড়েছিল বলেই তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তা না হ'লে মহারাণীকে বিয়ে না করবার কল্পনাও করতে পারতেন না তিনি। সমুদ্রবিলাসকে সম্মতি জানিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি তখন তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি হেঁটে যাচ্ছেন না, উড়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর দু'খানা পাখা গজিয়েছে, এখনই হয়তো আকাশে উড়ে ইন্দ্রধনুলোকের ইন্দ্রত্ব পদে সমাসীন হবেন।

...সব যখন ঠিক, তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। মহারাণী সমুদ্রবিলাসকে জানিয়ে দিলে সে শ্রীহর্ষকে বিয়ে করবে না।

"কেন ?"

"ওকে পছন্দ নয় আমার।"

মেয়ের মুখে এরকম স্বাধীন মতামত শুনবেন প্রত্যাশা করেননি সমুদ্রবিলাস। রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর উল্টো ধারণাই ছিল বরাবর। তিনি ভেবেছিলেন মহারাণী শ্রীহর্ষকে ভালোবাসে, বিয়ে হ'লে দুজনেই সুখী হবে, তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু এ কি বলছে মহারাণী!

একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, "ঝগড়া হয়েছে নাকি!"

"ঝগড়া কেন হ'তে যাবে। সাত চড়ে কথা কয় না, ওরকম লোকের সঙ্গে ঝগড়া হ'তে পারে নাকি কারও ?"

"তোদের দুজনের ছেলেবেলা থেকে এত ভাব, বিয়ে করতে আপত্তি করছিস কেন। খুব ভাল ছেলে শ্রীহর্ষ।"

ঘাড় বেঁকিয়ে মহারাণী বললে, "না, ওকে আমার পছন্দ নয়।"

অপরের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা রাখতেন না সেকালের জমিদারেরা, তাঁদের পছন্দ অনুসারেই চলতে হ'ত সকলকে। কিন্তু একমাত্র মেয়ের অপছন্দকে তুচ্ছ করতে সাহস করলেন না সমুদ্রবিলাস।

"এমন সুপাত্রটিকে নাকচ ক'রে দিচ্ছিস, কি নিয়ে থাকবি সারাজীবন ?"

এর উত্তর না দিয়ে মুচকি হেসে মহারাণী চলে গেল অন্দরমহলে। তারপর দেখা গেল সে তার নতুন-কেনা পাহাড়ী ঘোড়া পবনের পিঠে চ'ড়ে বেরিয়েছে হাওয়া খেতে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে আরও দুটো পাহাড়ী ঘোড়ায় দুজন হাবসি খোজা ঘোড়সোয়ার। অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী তারা, মহারাণীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে। মহারাণী যখন বেরোয় তখন রক্ষক হিসাবে সঙ্গেও চলে তারা। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের আদর্শটা সেকালের অভিজাত-বংশীয় মেয়েদের মধ্যে চলতি হয়েছিল কিছুদিন। সমুদ্রবিলাস এটা

তেমন পছন্দ করতেন না, কিন্তু মেয়ের আবদার রক্ষা করতে হয়েছিল। মেয়ে যখন ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে গেল তখন তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তিনি, তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

দিন কয়েক আগে পর্বতবিলাস আবু পাহাড় থেকে ফিরেছিলেন। পরামর্শ করবার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। সব শুনে পর্বতবিলাস বললেন, "ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করো না দাদা। বরং ও যাতে আর পাঁচ রকম ব্যাপারে মেতে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা কর। চিড়িয়াখানা আর বাগান নিয়ে ওর খানিকটা সময় কাটছে বটে, ঘোড়ায় চড়তেও বেশ শিখেছে, কিন্তু আমার মনে হয় ওসব বেশীদিন ভাল লাগবে না ওর। নওলকিশোর বা জীমন বাইজির কাছে গান শিখতে শুরু করুক। গানে যদি মেতে যেতে পারে তাহলে আর ভাবনা নেই, ওই নিয়েই সারাজীবন মশগুল হয়ে থাকতে পারবে। আর গান যদি না ভালো লাগে তাহলে মন্তর নিক। আমাদের ভব-দাই দিতে পারেন, একজন উঁচু দরের সাধক উনি, যদিও বাইরে কোন প্রকাশ নেই।"

রক্তাম্বর-পরিহিত ত্রিপুণ্ড্রক-লাঞ্ছিত-ললাট পর্বতের দিকে চেয়ে রইলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। তারপর বললেন, "এসব উদ্ভট খেয়াল তোমার মাথায় আসছে কেন? মেয়েকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করাই প্রত্যেক পিতার কর্তব্য। শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে ভাল হ'ত, ওকে ঘর-জামাই করতে পারতাম। কিন্তু মহারাণীর ওকে পছন্দ নয়। মুশকিলে পড়েছি তাই। ওর বয়স চোদ্দ পেরিয়ে গেল, গৌরীদান তো হ'লই না, এখন পূর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হচ্ছেন। কিন্তু করি কি, আমি অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছি, কিন্তু মনোমত পাত্র জুটছে না। ভাল ঘরের কোন ছেলেই ঘরজামাই হতে চায় না। রহড়ার কুলেশ বাঁড়ুয্যে,

বেদগ্রামের ভরত গাঙ্গুলী, সন্‌জার নৃপতিমোহন, প্রত্যেকেরই ভাল ছেলে আছে, বিষয়ের লোভে প্রত্যেকেই বিয়ে দিতে রাজিও আছে, কিন্তু ঘরজামাই হ'তে চাচ্ছে না কেউ। অথচ মহারাণী আমার একমাত্র মেয়ে ওকে আমি দূরে পাঠাতে পারব না।"

"সবই বুঝলাম"—ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন পর্বতবিলাস—"কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা—"

"কি কথা ?"

"বিশ্বদেব শর্মার অভিশাপটা। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর অভিশাপ ফলবে। তাই আমার মনে হয় মহারাণী যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলেই সেটা যথেষ্ট সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেওয়া উচিত আমাদের। বিয়ের পরই ও যদি বিধবা হয়, কিম্বা মৃত-বৎসা হয় তাহলে সেটা আরও দুঃখের হবে—"

"তুমি ব্রহ্মশাপে বিশ্বাস কর ?"

"করি। বিন্ধ্যাচলে বিশ্বদেবের সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল আমার। তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। আমাকে দেখে তিনি আবার অভিশাপ দিলেন। আমরা মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে বাস করছি। এর মধ্যে বাইরের লোককে টেনে আনা অনুচিত মনে করি আমি।"

"তোমার মত শুনলুম, কিন্তু মহারাণীর আমি বিয়ে দেব। গালুটির বড় তরফের ভালো ছেলে আছে একটি। যদিও সে-ও ঘরজামাই হতে চাইবে না, কিন্তু ওরা পাশের গ্রামেই থাকে, ওইখানেই কথাটা পাড়তে চাই। ছেলেটির নাম মহেন্দ্রনাথ। আমার ইচ্ছে তুমিই গিয়ে কথাটা পাড়।"

"আমার মত আপনাকে বললাম। কিন্তু আপনার আদেশ আমি পালন করব। পরশু যাব।"

"পরশু কেন, কালই যাও না।"

"পরশু সর্ব-সিদ্ধা ত্রয়োদশী, কাল দিনটা ভাল নয়।"

পর্বতবিলাস চলে যাবার পর সমুদ্রবিলাস নিরুপায় ক্ষোভে অর্ধ-স্বগতোক্তি করলেন—"মত, মত, মত, সবাই মত্-বাজ হয়ে উঠেছে আজকাল, এমন কি ওই একরত্তি মেয়েটা পর্যন্ত—এই হো—"

কাউকে ডাকতে হলে "এই হো—" ব'লে চীৎকার করে উঠতেন তিনি।

দেউড়ির সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"নাচঘর ঠিক কর—"

জীমন বাইজি আজকাল বুড়ো হয়ে গেছে। তার মেয়ে দীনাই আজকাল মনোরঞ্জন করে সমুদ্রবিলাসের। সে অবাক হ'ল একটু। তুপুর বেলা গানের আসর বসবে কি! কিন্তু রাজাসাহেবের যখন হুকুম তখন বসল। দীনা হাতের বাজুর দোলক তুলিয়ে লীলাভরে হাত তুলে তান ধরল মেঘমল্লারে। গান শেষ হয়ে গেলে সিরাজীর পাত্রটা নামিয়ে রেখে সমুদ্রবিলাস জিগ্যেস করলেন, "এ সময় মেঘমল্লার গাইলে কেন দীনা? তুপুরে সারং শোনাতো ভালো।"

দীনা মুচকি হেসে অপাঙ্গে চেয়ে উত্তর দিল, "যা গরম, মেঘেরই দরকার এখন—"

সমুদ্রবিলাস বুঝলেন এটা দীনা বাইজির বিদ্রূপ তুপুরে আসর বসানো হয়েছে ব'লে। চোখ তুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর, তার থেকে উপচে পড়তে লাগল হাসি।

"ও, গরম লাগছে না কি! এই হো—"

দ্বারপ্রান্তে চাকর এসে দাঁড়াতেই তিনি হাত দিয়ে ইশারা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন পানীয় চাই। বিলিতি মদ আর শরবৎ এল। আসতে একটু দেরী হ'ল, কারণে সেকালে বরফের তত চলন হয়নি, ঠাণ্ডা করবার জন্যে মদের বোতল পাঁকে পুঁতে রাখতে হ'ত। চাকর পাশের ঘরে সব সরঞ্জাম রেখে এল, দীনা বাইজি সেইখানেই উঠে গেল।

সমুদ্রগোপের বাবরি ছিল, চাপ চাপ দাড়ি আর গোঁফও ছিল। কিছুক্ষণ পরে মদ খেয়ে তিনি যখন স্তিমিত লোচনে বসে রইলেন, মনে হ'তে লাগল একটা সিংহ ঢুলছে।

সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশীর দিন সকালে তুরুক সোয়ার ইয়াকুব আলি অশ্বারোহণে সদর নায়েবের একটি চিঠি নিয়ে গালুটির বড় তরফের হুজুরকে সেলাম করতে গেল। পত্রে লেখা ছিল ছোটবাবু বিকেলবেলা দেখা করতে যাবেন। পর্বতবিলাস বিকেলে গেলেন সুসজ্জিত হাতীতে চ'ড়ে। গালুটির বড় তরফ রাজেন্দ্রনাথ প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে সমুচিত অভ্যর্থনা করলেন তাঁর। তাঁকে নিজের খাস বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। সাধারণ কুশল প্রশ্নাদির পর পর্বতবিলাস প্রস্তাবটি পাড়লেন অবশেষে, রাজেন্দ্রনাথ ঘাড় কাৎ ক'রে শুনলেন সেটি। কিছুক্ষণ ঘাড় কাৎ ক'রেই রইলেন, তারপর বললেন, "এ তো খুব আনন্দের কথা। আমাদের স্টেট পাশাপাশি, বন্ধুত্বও আছে, সেটা যদি আত্মীয়তায় পরিণত হয় তাহলে তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে। কিন্তু একটি শর্ত আছে, ও মেয়েকে ঘোড়ায় চড়া ছাড়তে হবে। ঝাঁসীর রাণীকে পুত্রবধূ করা নিরাপদও নয়, সুখেরও নয়।"

পর্বতবিলাসের মুখভাব যেমন সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল তেমনই রইল, মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না; কিন্তু, সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতসারেই, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল এক ঝলক বিদ্যুৎ। তিনি যখন কথা কইলেন, তখন বেশ শান্তকণ্ঠে সবিনয়েই বললেন, "আচ্ছা, আপনি যা বললেন তা দাদাকে বলব।"

বৈঠকখানা মহল পেরিয়ে যখন পর্বতবিলাস হাতীতে চড়তে যাচ্ছেন তখন আর একটি ঘটনা ঘটল। পাশেই ছিল ফুলের বাগান, অনেকগুলি ছোট ছোট কুঞ্জ ছিল সেখানে; নানারকম শৌখীন লতা দিয়ে ঘেরা, ফুলে ফুলে ভরা। মাধবী কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে

এল দরবারের গায়িকার কন্যা বেদানা। তন্বী ষোড়শী, নীল শাড়ি নীল ওড়না, চোখে সুর্মার সূক্ষ্ম টান, মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি। সে এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে বললে—"বড়কুমার-সাহেবের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন হুজুর ?"

"হ্যাঁ—"

একটু ইতস্তত ক'রে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। তারপর সেলাম ক'রে মৃদুগতিতে চলে গেল। পর্বতবিলাস বুঝলেন এ-ও একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত। তিনি ফিরে এসে দাদাকে যথাযথ বললেন সব। গুম হয়ে রইলেন সমুদ্রবিলাস। কয়েকদিন গুম হয়েই রইলেন। তারপর তিনি যা করলেন তা সম্ভবত তিনি কখনও করেননি জীবনে। মহারাণীকে একদিন আড়ালে ডেকে বললেন, "আমার একটা অনুরোধ রাখবি ?"

"কি ?"

"ঘোড়ায় চড়াটা ছেড়ে দে তুই—"

"হঠাৎ একথা বলছ কেন ?"

"লোকে নিন্দে করছে। তাছাড়া তোর আমি বিয়ে দিতে চাই, ঘোড়সোয়ার মেয়েকে কে বউ ক'রে নিয়ে যাবে বল্।"

"আবার কার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে ?"

"গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে।"

"সম্বন্ধ আগে পাকা হোক তারপর দেখা যাবে।"

"ঘোড়ায় চড়া না ছাড়লে সম্বন্ধ পাকা হবে না।"

"ও, তাই বুঝি। আচ্ছা—"

"শুনলাম তুই ছাতে বাগান করছিস ?"

"হ্যাঁ। কিশোরীকাকা যে মেয়েটিকে এনেছেন তাকে একটা কাজ দিতে হবে তো—"

"ওই বাগান টাগান নিয়েই থাক। ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দে—"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা"র অর্থ সমুদ্রবিলাস বুঝলেন সম্মতি, কিন্তু মহারাণীর মনে ছিল অন্য অর্থ। সে মুখে বলেছিল 'আচ্ছা', কিন্তু মনে মনে বলেছিল, 'আচ্ছা দেখে নেব।'

মহারাণীর বিয়ে নিয়ে পর্বতবিলাস আর মাথা ঘামালেন না। কিছুদিন আগে মন্দার পাহাড়ের এক সাধুর খবর পেয়েছিলেন, সেইখানেই চলে গেলেন তিনি। রাজেন্দ্রনাথকে এবার পত্র লিখলেন সমুদ্রবিলাস স্বয়ং। ম্যানেজার কিশোরীমোহন নিয়ে গেলেন সেটি।

চিঠিতে ভদ্র ভণিতার পর তিনি লিখলেন—"শ্রীমান পারুর মুখে সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। অশ্বারোহণ ব্যাপারে তাহাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছি, সে-ও রাজি হইয়াছে। এবার শ্রীমান শ্রীমতীর যোটক বিচারের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। এ বিষয়ে একটু ত্বরা করিতে চাহি, কারণ শরীর অসমর্থ হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে মেয়েটিকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারি। আশা করি আপনি বিবেচনা করত যাহাতে আমি ত্বরায় দায়মুক্ত হইতে পারি সে ব্যবস্থা করিবেন।"

বেদানার কথাও পর্বতবিলাস বলেছিলেন অগ্রজকে, কিন্তু সেটার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না সমুদ্রবিলাস। তাঁর মতে ওটা পৌরুষেরই লক্ষণ। যৌবনকালে অমন দু'একটা লীলা-সঙ্গিনী থাকতই সব বড়লোকদের, তার জন্য বিয়ে আটকাত না কারও। নিজের জীবনের মাপকাঠিতেই সমুদ্রবিলাস বিচার করতেন অপরকে। রাজেন্দ্রনাথ পত্র পেয়ে খুশী হলেন। ত্বরা করতেও ত্রুটি করলেন না, কারণ তিনি জানতেন বিয়েটা হয়ে গেলেই অতবড় সম্পত্তিটা তাঁরই ছেলের হবে শেষ পর্যন্ত। তাঁর

পুরোহিত মশায় এলেন একদিন ঘটা ক'রে, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে বিচার করলেন কোষ্ঠিটি এবং রায় দিলেন রাজ-যোটক হয়েছে। এ বিয়ে হবেই, হওয়া উচিতও।

কিন্তু হ'ল না। না হওয়ার কারণটা কি তা কেউ জানে না। পুরাতন ভৃত্য শম্ভু যা বলত তা খুব রহস্যময়। সে বলত, হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো ক'রে সবুজ কিংখাবের বোরখা-ঢাকা এক পালকি এল একদিন সন্ধেবেলা। সঙ্গে বরকন্দাজ এসেছিল। সে বললে, গালুটির বাবুদের বাড়ি থেকে 'জেনানা' এসেছে মহারাণীর সঙ্গে আলাপ করবেন বলে। সমুদ্রবিলাস হুকুম দিলেন, পালকি অন্দরমহলে নিয়ে যাও। অন্দরমহলে পালকি থেকে যিনি নাবলেন, শম্ভুর মতে, তিনি মানুষ নন পরী, কেবল ডানা দুটি ছিল না। শম্ভু বলে সেই পরীর কলা-কৌশলেই নাকি বিয়ে হ'ল না শেষ পর্যন্ত। কারণ সে আসার পর থেকেই একটা না একটা বাগড়া লাগতে লাগল। প্রথম বাগড়া লাগল, আর একজন জ্যোতিষী এসে বললেন যোটক বিচার ঠিক হয়নি। সমুদ্রবিলাস আমল দিলেন না তাকে। তারপর বাগড়া লাগল আশীর্বাদের দিন নিয়ে। কিন্তু আশীর্বাদের দিন-স্থির হ'ল যখন, তখন আসল বাগড়াটি লাগল। এর কারণ যে কি, মূল যে কোথায় তা জানা যায়নি। আশীর্বাদের ঠিক আগে গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা নির্ণীত হ'ল না অনেকদিন পর্যন্ত। খোঁজাখুঁজির ত্রুটি হ'ল না অবশ্য, কিন্তু তখনকার দিনে পথঘাট সুগম ছিল না, তার-বেতার সংবাদ-পত্রেরও প্রাচুর্য ছিলনা এত। লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখে লিখে খোঁজখবর করতে হ'ত। রাজেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছ'মাসের আগে কুমারের কোন খবর পাওয়া গেল না। ছ'মাস পরে মহেন্দ্রনাথ নিজেই ফিরে এলেন, কিন্তু

বিয়ে হ'ল না, কারণ সমুদ্রবিলাস ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নিজের অন্তর্ধানের যে কারণ সবাইকে বলেছিলেন তা অদ্ভুত শোনাবে আজকাল। তিনি বললেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি শিকার করতে গিয়েছিলেন, জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েন, তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক দুর্গম অরণ্যে বন্দী ক'রে রাখে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে এইভাবে কিছুদিন আটকে রেখে পরে ক্রমশ তাদের দল-ভুক্ত ক'রে নেওয়া। তাঁর মতো লোককে নিজেদের দলে টানতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধা হ'ত না কি তাদের। এ কল্পনা উদ্ভটও ছিল না সেকালে। অনেক জমিদারের ছেলে আগে ডাকাতি করত। মহেন্দ্রনাথ বললেন অনেক রকম ফন্দি-ফিকির ক'রে তবে পালিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি। এজন্য একজন ডাকাতকে তাঁর বহুমূল্য কমল-হীরের আংটিটা নাকি ঘুস দিতে হয়েছে। একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি, কারণ এটা অবিশ্বাস্য ছিল না সেকালে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুজনিত কালাশৌচ কেটে যাবার পরও মহেন্দ্রনাথ আর বিয়ে করতে চাইলেন না কেন তার ঠিক হদিসটা পাওয়া যায়নি। তিনি ওজুহাত দেখালেন ডাকাতদের নজর তাঁর উপর একবার যখন পড়েছে তখন সহজে তারা তাঁকে নিস্তার দেবে না। এ অবস্থায় এক ভদ্রকন্যাকে বিয়ে ক'রে বিপন্ন করার কোনও মানে হয় না। সে যুগের পক্ষে এরকম আচরণ অপ্রত্যাশিত, কারণ ভদ্রকন্যাদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা সেকালে বিশেষ কেউ করত না, পটাপট বিয়ে করাটাই রেওয়াজ ছিল সে যুগে। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু বিয়ে করতে চাইলেন না। তাঁর মত-পরিবর্তনের চেষ্টাও অনেক হয়েছিল। রাজেন্দ্রনাথ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করবারও ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল বেদানার সঙ্গে তাঁর প্রণয়টা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, প্রকাশ্যভাবে 'বেদানা মহল' তৈরি ক'রে সানন্দে বাস

করছেন মহেন্দ্রনাথ। ডাকাতের দলও তাঁকে দলভুক্ত করতে চেষ্টা করেছে এ কথাও আর শোনা যায়নি।

এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীটির নাম পলটু। মহারাণীর ঘোড়ার সহিস। সে মহেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের যে কারণ বলত তা বেশ রহস্যঘন। সে বলত অবশ্য চুপি চুপি চাকরবাকর মহলে। কথাটা সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর আগে প্রকাশও পায়নি, পলটুই প্রকাশ করেনি। পলটু বলত যেদিন গালুটি থেকে কিংখাব-ঢাকা পালকি এল তার চারদিন পরেই ছিল পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমার দিন গভীর রাত্রে মহারাণী নাকি একা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিল। পলটুও জানতে পারত না, কিন্তু ঘোড়ার জিন-লাগাম ছিল সাজ-ঘরে আর তার চাবি থাকত পলটুর কাছে। তাই তাকে জাগাতে হয়েছিল। মহারাণীর সাজ-সজ্জা দেখে পলটু তো অবাক। মেয়েছেলে ব'লে চেনবার জো নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। বেরিয়ে যাবার আগে মহারাণী তর্জনী আস্ফালন করে পলটুকে বলে গেল, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারেন যে আমি এমনভাবে বেরিয়ে গেছি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পলটু কথাটা কাউকে বলেনি। কিন্তু আর একটা কাজ করেছিল সে। মহারাণীর অনুসরণ করেছিল আর একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে। শুধু কৌতূহল নয়, আশঙ্কা-মিশ্রিত বাৎসল্যও এ কার্যে প্রণোদিত করেছিল তাকে। মহারাণীকে জন্মাতে দেখেছিল সে, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষও করেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল সে—এত রাত্রে মেয়েটা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে একলা এমন ক'রে। মানা করলে তো শুনবে না, পিছু পিছু যাওয়াই ভাল। গ্রামের দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠটাতেই মহারাণী প্রায় যেত ঘোড়াটাকে নিয়ে। পলটু সেইদিকেই গেল। আর একটু দেরি হ'লে মহারাণীকে আর সে দেখতে পেত না। কারণ, সে যখন মাঠের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখনই দেখতে পেল

মহারাণীর ঘোড়া মাঠ পেরিয়ে প্রকাণ্ড আমবাগানটায় ঢুকছে। আমবাগানের ওপারে দিগন্তবিস্তৃত আর একটা মাঠ আছে। আমবাগানের কাছাকাছি এসেই পল্টু নামল ঘোড়া থেকে। তার সন্দেহ হ'ল এই বাগানের ভিতর ব্যাপার আছে কিছু। ঘোড়াটা একটা গাছে বেঁধে পদব্রজে অগ্রসর হ'ল সে, গাছের ছায়ায় ছায়ায়। কিছুদূর গিয়েই সে বুঝতে পারল তার অনুমান মিথ্যা নয়, আর একজন অশ্বারোহী রয়েছেন, গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথ। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এগিয়ে খুব কাছাকাছি এসে আড়ি পেতে রইল পলটু। যা শুনল তাতে চমৎকৃত হয়ে গেল সে। চাকর-বাকর মহলে এই চমকপ্রদ ব্যাপারের যা বর্ণনা করত সে তা গুছিয়ে লিখলে এইরকম দাঁড়ায়।

মহারাণী মহেন্দ্রনাথের কাছে আত্মপরিচয় দেয়নি। কথাবার্তা থেকে পলটুর মনে হয়েছিল সে নিজেকে মহারাণীর দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ বলছিলেন, "বেদানা যে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করেছে তা আমি জানি। বেদানাকে অবশ্য আমি ত্যাগ করব না, কিন্তু তা ব'লে আপনার বোনকে বিয়ে করবার লোভও তো আমি ত্যাগ করতে পারছি না।"

"কেন?"

"কেন তা কি সব সময় খুলে বলা যায়?"

"মহারাণী একটা কথা বিশেষ ক'রে আপনাকে বলতে ব'লে দিয়েছে। বলেছে বিষয়ের জন্য আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে উৎসুক হ'য়ে থাকেন তাহলে বিয়ে না করলেও চলবে। বিষয়ের প্রতি মহারাণীর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। সে যখন বিষয়ের মালিক হবে তখন নিজের ভরণ পোষণের মতো সামান্য সামান্য কিছু রেখে বাকিটা আপনাকেই দান ক'রে দেবে।"

মহেন্দ্রনাথ হেসে বাম গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিলেন একবার। তারপর

বললেন, "আমি তার দান নেব কেন। তাকে ব'লে দেবেন আমি বিষয়ের লোভে তাকে বিয়ে করতে চাইছি না। আমি লোকমুখে তার অনেক গুণের কথা শুনেছি। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন রূপগুণের সমন্বয় নাকি দেখা যায় না। তিনি লেখাপড়া জানেন, গান বাজনা জানেন, শুনেছি তিনি সাহসী এবং সুরসিকা। এমন রূপসী গুণবতী যদি আমার সহধর্মিনী হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

"কিন্তু তিনি বেদানাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"

"কিন্তু ওসব প্রতিশ্রুতির কি কোনও মূল্য থাকা উচিত? বেদানা সামান্য একজন বাইজির মেয়ে, তার জন্যে আমি কি—'

"মহারাণীর মতে বাইজির মেয়ে হলেও সে মানুষ। সে আপনাকে ভালবাসে, তার সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার ইচ্ছে মহারাণীর নেই। তাই মহারাণীর অনুরোধ আপনি এ বিয়েটা ভেঙে দিন। মহারাণী নিজেই ভেঙে দিতে পারত কিন্তু কিছুদিন আগে সে একটা সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে, বারবার বাবার মুখের উপর না বলতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"আমিই বা আমার বাবার মুখের উপর 'না' বলি কি ক'রে। তাছাড়া আমি তাঁকে মত দিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি যদি ভেঙে দিতে ইচ্ছে করেন অনায়াসে তা পারেন। মহারাণী বলেছে পুরুষ মানুষে না পারে এমন কাজ নেই। সে একটা সহজ উপায়ও ব'লে দিয়েছে।"

"কি উপায়?"

"আপনি কিছুদিনের জন্য দেশ-ভ্রমণ ক'রে আসুন না, কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়ুন বাড়ি থেকে। আপনি অন্তর্ধান করলে আপনাকে খোঁজবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই, বিয়ের কথাটা চাপা পড়ে যাবে।"

"কিন্তু আমি তা করব না। কারণ মহারাণীকে আমি চাই।"

"জোর ক'রে তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা যদি করেন তাহলে কিছুতেই তাকে পাবেন না। সে হয়তো আত্মহত্যা ক'রে বসবে, কিন্তু তার এ অনুরোধটা যদি রাখেন তাহলে বরং পেতে পারবেন তাকে। মনে মনে চিরকাল ও আপনারই থাকবে। আর আপনি যদি কিছুতে ওর অনুরোধ না রাখতে চান তাহলে আর একটা কথা ও বলেছে, জানিনা এতে আপনি সম্মত হবেন কি না।"

"কি কথা?"

"সে বলেছে ঘোড়-দৌড়ে আপনি যদি আমাকে হারাতে পারেন তাহলে সে আপনাকে বিয়ে করবে যদি বেদানা অনুমতি দেয়।"

"আপনাকে হারাতে হবে? মহারাণী নিজেই শুনেছি ভাল ঘোড়-সোয়ার। বাজিটা তার সঙ্গে হ'লে আরও খুশি হতাম।"

"কিন্তু সে আমাকেই পাঠিয়েছে।"

"বেশ চলুন, দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।"

বাগানের ওপারে যে মাঠটা আছে সেইটেতে তখন শুরু হ'ল ঘোড়-দৌড়। পলটু বলে, একবার নয়, তিন তিনবার তাকে হারিয়ে দিলে মহারাণী। তারপর পিরাণের পকেট থেকে একছড়া হীরের হার বার করে মহারাণী মহেন্দ্রনাথকে বললে—"মহারাণী আমাকে এই হারটা দিয়ে বলেছিল যদি হেরে যাও তাহলে এটা দিয়ে এস মহেন্দ্রনাথকে, আর যদি জেত তাহলে তাঁকে অনুরোধ কোরো প্রতিশ্রুতির চিহ্ন স্বরূপ তিনি যেন কিছু একটা দিয়ে দেন।"

মহেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হাত থেকে নিজের আংটিটা খুলে দিলেন তাকে। বললেন, "মহারাণীর আদেশ আমি পালন করব। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করবার চেষ্টা আর আমি করব না। কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে তাঁকে বোলো—"

"বলুন, নিশ্চয় বলব।"

"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দেখা ক'রে কি হবে ?"

"তাঁকে মুখোমুখি দেখবার একটা কৌতূহল আছে।"

"সে কৌতূহল মিটলে তবে বিয়েটা ভেঙে দেবেন ?"

"হ্যাঁ।"

মাটিতে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ।

হঠাৎ মহারাণী পবনের পিঠে লাফিয়ে চড়ল এবং মহেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বলল, "কৌতূহলটা তাহলে মিটিয়ে ফেলুন। আমিই মহারাণী।"

পরমুহূর্তেই লাগামের ইশারায় পবনের মুখ ঘুরল, বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল সে। মহেন্দ্রনাথ কিছুদূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু নাগাল পাননি।

পলটুর এই গল্প কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। কিন্তু গল্পটা চালু হয়েছিল খুব। পলটু যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে হলপ করে বলত যে সে একবর্ণ অতিরঞ্জিত ক'রে বলেনি। গল্পটা মহারাণীর কানেও গিয়েছিল, শুনে একটু মুচকি হেসেছিল শুধু সে, পলটুকে ভর্ৎসনা করেনি।

সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে গেল কিছুদিন। কিন্তু বছর দুই পরে তৃতীয় প্রস্তাবও এসেছিল একটা, এবং আশ্চর্যের বিষয় এবার প্রস্তাবটা এনেছিলেন পর্বতবিলাস স্বয়ং। পর্বতবিলাস ছিলেন তখন সুলতানগঞ্জের গৈবীনাথ পাহাড়ে। তিনি একটি পত্রে প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন মহারাণীকে। পত্রটি বহন ক'রে আনেন এক সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় যুবক। তিনি অবশ্য সোজা আসেননি, কিম্বা নগণ্য পত্রবাহকরূপেও আসেননি, বেশ সমারোহ সহকারে এসেছিলেন তিনি, সঙ্গে লোকজন ছিল অনেক, পাশের গ্রামে এসেছিলেন প্রথমে। তিনি পর্বতবিলাসের যে

পত্রটি এনেছিলেন সেটি আধুনিক সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করলে এইরূপ দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকা সহায়

মোকাম সুলতানগঞ্জ
বিহার

অসংখ্য আশীর্বাদান্তে নিবেদনমেতৎ,

মা, মহারাণী, মা কালীর অনুগ্রহে আশা করি তোমরা মঙ্গলমত আছ। একটি বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে তোমাকে এই পত্রটি লিখিতেছি। তাগিদটি আমার বিবেক-প্রসূত বলিয়াই আমার নিকট ইহা উপেক্ষণীয় নহে, তাই এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। তুমি বিশেষ চিন্তা করিয়া তবে যথাকর্তব্য স্থির করিবে। ব্যাপারটি তোমার বিবাহ-বিষয়ক। দাদা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন একাধিকবার তিনি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তখন আমিই তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম বিবাহ না দেওয়াই উচিত, কারণ তুমি বোধ হয় জান আমরা ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত, তাই তখন আমার মনে হইয়াছিল, বিবাহ দিলে তুমি শান্তি পাইবে না, হয়তো অমঙ্গলই হইবে। ঘটনাচক্রে দাদার জীবদ্দশায় বিবাহ হয়ও নাই। ওই ব্রহ্মশাপের জন্যই আমি কৌমার্যব্রত পালন করিতেছি। কিন্তু একটি আইনের কথা আমার মনে ছিল না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বে একটি আইন করিয়াছিলেন যে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাজা-মহারাজাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এখন শুনিতেছি এই আইন নাকি জমিদারদের সম্বন্ধেও বলবৎ হইবে। ইহাও শুনিতেছি অপুত্রক জমিদারদের সম্পত্তি সরকার তাঁহার অনুগৃহীত লোকদের দিবেন। আমাদের বংশের ঘোর শত্রু ছাগলা-পাড়ার জমিদার রটাইয়া বেড়াইতেছে যে আমাদের জমিদারি সেই নাকি শেষ পর্যন্ত ভোগ করিবে, কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে নাকি একথা বলিয়াছেন। ইহার পর সে আমাদের কালীমন্দির হইতে

দক্ষিণাকালীর বিগ্রহ সরাইয়া সেই স্থানেই নাকি নাড়ুগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিবে, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে থাকিবে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আমাদের সম্পত্তি পাইলে সে কি কি করিবে তাহা ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কালনেমির লঙ্কা ভাগের গল্প মনে পড়ে। হয়তো ইহা গুজব মাত্র। কিন্তু এ কথাটা আমার এখন মনে হইতেছে আমাদের বংশরক্ষার চেষ্টাটা অন্তত করা উচিত, চেষ্টা করিয়া যদি কৃতকার্য না হওয়া যায় তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইন্দ্রজিৎ রায়ের বংশধরেরা আমাদের পূর্ব পুরুষের ভিটায় বসবাস করিয়া মা কালীর মন্দিরে নাড়ু-গোপাল স্থাপন করিয়াছে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। সুতরাং বংশ-রক্ষার চেষ্টা করিতেই হইবে, ফলাফল অবশ্য মায়ের হাতে। আমার নিজের আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, আমার বয়সও হইয়াছে, তাছাড়া মায়ের সেবায় আমি বহুদিন পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাকেই বিবাহ করিতে হইবে। দাদা বাঁচিয়া থাকিলে কোথাও না কোথাও তোমার বিবাহ দিতেনই। নানা দিক হইতে ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অভিভাবক হিসাবে যদি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত না হই, দাদার পর-লোকগত আত্মা শান্তি পাইবেন না, আমারও কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। তাই আমি তোমার জন্য একটি সৎপাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম, মায়ের কৃপায় একটি সৎপাত্র পাইয়াছি। তান্ত্রিক যোড়শীনাথ একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট একদিন শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি ব্রাহ্মণ যুবকের কর-কোষ্ঠি বিচার করিয়াছিলেন, তাহার কর-কোষ্ঠিতে নাকি শত-পুত্র হইবার চিহ্ন আছে। কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হয় এই পাত্রের সহিত যদি তোমার বিবাহ দিতে পারিতাম তাহা হইলে ইহার ভাগ্য প্রভাবে হয়তো আমাদের বংশরক্ষা হইতে পারিত, হয়তো ব্রহ্মশাপও কাটিয়া যাইত। তখন কিন্তু যুবকটির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়

নাই, ষোড়শীনাথও তাহার সঠিক সংবাদ আমাকে আর দিতে পারেন নাই। জনৈক কন্যার পিতার অনুরোধে যোটক বিচারের জন্য ইঁহার কর-কোষ্ঠি দেখিয়াছিলেন, পাত্রটির অপঘাত-মৃত্যু যোগ থাকায় কন্যার পিতা বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়াছেন, ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তিনি জানেন না। কিন্তু মহামায়ার এমনই বিচিত্র যোগাযোগ পাত্রটির পুনরায় নাগাল পাইলাম, শুধু তাহাই নহে, সে নিজেই আসিয়া বিবাহের প্রস্তাবও করিল। গত সূর্য-গ্রহণের সময় তুমি বোধহয় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলে, তখন গঙ্গার ঘাটে সে তোমাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর সে তোমার খোঁজ লইয়া অবশেষে আমার কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করে। তাহার পিতামাতা কেহ জীবিত নাই, সে নিজেই নিজের অভিভাবক। জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমাদের পালটি ঘর। এ সব সংবাদ অবশ্য তাহারই মুখে শুনিয়াছি, সবিশেষ খোঁজ করি নাই। বিহার প্রদেশের ডিহি দরিয়াপুর গ্রামে ইহার নিবাস। জমিদারি আছে। তাহাকে তান্ত্রিক ষোড়শীনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তিনিই আমাকে গোপনে বলিলেন, এই সেই যুবক যাহার শতপুত্রের পিতা হওয়ার যোগ আছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, অনুভব করিলাম হয়তো ইহা মহামায়ারই ইঙ্গিত। কিন্তু ইঁহার সহিত বিবাহ বিষয়ে শেষ কথা বলিবার পূর্বে তোমার অভিমত লওয়া প্রয়োজন। তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছ, দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে তোমার একটা নিজস্ব মতামত আছে। আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে চাহিনা। এই সব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং পাত্রকেই তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। এই পত্র তাঁহার হাতেই পাঠাইলাম। ইনি শুনিয়াছি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ইঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিও। তুমি অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিয়া এবং প্রয়োজন হইলে আলাপ

করিয়া আমাকে জানাইও ইঁহাকে তোমার পছন্দ হইল কি না। এই ব্যক্তি শতপুত্রের পিতা হইবে তান্ত্রিক ষোড়শীনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে অত্যন্ত আশান্বিত করিয়াছে। বংশরক্ষা ছাড়াও তোমাকে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের ওই প্রকাণ্ড বাড়িতে তুমি দাস-দাসী লইয়া একা থাক, তোমার পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই, ইহা বড়ই দৃষ্টিকটু। মিথ্যা করিয়াও কেহ যদি তোমার নামে কলঙ্ক রটায় তাহা আমাদের বংশের মান লাঘব করিবে। যাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি তিনি সুস্থ, সমর্থ, বলিষ্ঠ পুরুষ। আপাতদৃষ্টিতে তোমার যোগ্য পাত্র বলিয়াই মনে হয়। তোমার সহিত বিবাহ হইলে ইনি ডিহি দরিয়াপুরের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তোমার নিকটেই থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিয়াছেন। সব দিক বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে উত্তর দিও। তোমার সম্মতি পাইবার পর আমি ইঁহার বংশ প্রভৃতির সবিশেষ সন্ধান লইব। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক শ্রীপর্বতবিলাস চৌধুরী।

মহারাণীর পাণিপ্রার্থী যুবক উদয়প্রতাপ সরাসরি মহারাণীর বাড়িতে আসেননি, একথা আগেই বলেছি। তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে প্রথমে উঠেছিলেন দাউদপুরের সরাইখানায়। তিনি এসেছিলেন সুসজ্জিত পালকিতে, সঙ্গীরা অশ্বারোহণে। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে এল কয়েকখানা গরুর গাড়ি তাঁবু আর তৈজসপত্র বোঝাই ক'রে। গরুর গাড়ির সঙ্গে এল আসাসোটাধারী বরকন্দাজের দল। দাউদপুরের মাঠেই সারি সারি তাঁবু পড়ল কয়েকখানা। বেশ সমারোহ সহকারে ডিহি দরিয়াপুরের জমিদার উদয়প্রতাপ রায় নিজেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহারাণীর বাড়ির কাছে। রটে গেল তিনি শিকার করবার জন্যে এসেছেন।

একটা নেকড়ে বাঘও মারা পড়ল তাঁর গুলিতে। দেখতে দেখতে চারিদিকে বেশ নাম-ডাক হয়ে গেল তাঁর। এ অঞ্চলে নিজেকে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর তবে তিনি পর্বতবিলাসের চিঠিখানি পাঠালেন মহারাণীকে। চিঠিখানি এল একটি সুদৃশ্য পালকিতে চ'ড়ে এক রূপসী বাঁদীর মারফতে। পালকির পিছনে এল নানারকম উপঢৌকন। ফুল-ফলের ডালি, মালা কত রকমের, তাছাড়া অনেক রকম মিষ্টান্ন।

মহারাণী তখন নিজের বাগানে সিংহটার সঙ্গে খেলা করছিল। এই সিংহটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ মহারাণীর জীবনে এটিও একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অতি শিশু বয়স থেকে মহারাণী পুষেছে একে, বেশ পোষও মেনেছে। একসঙ্গে দু'জনে শোয় পর্যন্ত এক বিছানায়। এক আর্মানি সাহেবের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে সে কিনেছিল একে। আর্মানি সাহেব বলেছিল, এটি হচ্ছে আসল আফ্রিকান সিংহের বাচ্ছা। যদি ঠিক মতো পালন করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যিই ও পশুরাজ। সিংহটির সঙ্গে আর্মানি সাহেব একটি কাফ্রি মেয়েকেও বিক্রি ক'রে গিয়েছিল মহারাণীর কাছে। সেকালে লুকিয়ে চুরিয়ে, অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবেও, তখন মানুষ বিক্রি হ'ত; মেয়েটার সম্বন্ধে যে কাহিনী আর্মানি সাহেব বলেছিল তা রূপকথার মতো বিস্ময়কর। ওর বাবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে নানারকম পশু ধ'রে বিক্রি করত। সিংহিনীর কাছ থেকে তার বাচ্ছা কেড়ে আনাই তার বিশেষত্ব ছিল একটা। কারণও ছিল এর। ওর একমাত্র ছেলেকে এক সিংহ মেরে ফেলেছিল। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য এই দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিল সে। প্রথম প্রথম সিংহের বাচ্ছা ধ'রে পাথরে আছড়ে সে মেরেই ফেলত সেগুলোকে। তারপর তার দেখা হয় এই আর্মানি বণিকের সঙ্গে। সে বাচ্ছাগুলোকে মারতে দিত না, কিনে নিত ভাল দাম দিয়ে। এই বাচ্ছাটা

কেনার কিছুদিন পরেই লোকটা মারা যায়। তাকেও সিংহের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। তখনকার লোকেরা এ বিষয়ে যে গল্পটা বলে তা অদ্ভুত। সিংহেরা না কি এক চাঁদনী রাতে মরুভূমির মধ্যে সভা ক'রে জেহাদ ঘোষণা করেছিল লোকটার বিরুদ্ধে। তাদের গর্জনে আকাশ, বাতাস এমন কি চন্দ্র তারা পর্যন্ত কম্পমান হ'য়ে উঠেছিল। তার পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে তারা যা করল তা অভূতপূর্ব। দল বেঁধে গ্রামের ভিতরে এসে লোকটার ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল তাকে। গ্রামসুদ্ধ লোক মার মার শব্দে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই মা মরা মেয়েটাও সেই ঘরে ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বলেনি সিংহরা। আর্মানি সাহেব তার জ্ঞাতিদের কাছ থেকে মেয়েটাকেও কিনে নেন। তাঁর সঙ্গেই মেয়েটি আছে বরাবর, ও-ই সিংহ-শিশুটির পরিচর্যা করে, এ বিষয়ে ওর বিশেষ দক্ষতা আছে। মহারাণী সিংহের বাচ্ছার সঙ্গে তার পরিচারিকা ম'টেসাকেও কিনে নিয়েছিল। আর্মানি সাহেব সিংহের বাচ্ছার নাম রেখেছিলেন আলেক্‌জাণ্ডার আর ওই জুলু মেয়েটার ইবনি। মহারাণী নাম বদলে দিয়েছিল। সিংহের বাচ্ছার নাম হ'ল মহারাজ আর ইবনির নাম হ'ল কষ্টি। কষ্টি বাংলা শিখেছিল, বুঝতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না।

কষ্টিই উদয়প্রতাপের বাঁদীকে নিয়ে এল মহারাণীর কাছে। বাঁদী আভূমি প্রণত হয়ে পর্বতবিলাসের চিঠিখানি মহারাণীকে দিল এবং ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সিংহটার দিকে। সিংহটাও ঘাড় উঁচু ক'রে নির্নিমেষে দেখছিল এই আগন্তুককে, [illegible] গলার ভিতর থেকে গরগর গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছিল একটা।

"ছিঃ, ও কি অসভ্যতা—"

মহারাণী ছোট একটি চাপড় মেরে তারপর গলা জড়িয়ে চুমু খেলে তার গালে।

মহারাজ প্রশমিত হ'ল। খুশীও হ'ল। মহারাণীর কোলের উপর

ছুই থাবা তুলে দিয়ে মাথাটা ঘসতে লাগল তার বুকে। মহারাণী তখন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন বাঁদীর দিকে।

"কার চিঠি ?"

"আপনার কাকার। আমার মনিব নিয়ে এসেছেন।"

"কে তোর মনিব।"

"উদয়প্রতাপ রায়।"

"ও, দাউদপুরের মাঠে যাঁর তাঁবু পড়েছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মহারাণী চিঠিখানি পড়ল আগাগোড়া। তারপর বলল, "আচ্ছা, তোমার মনিবকে আসতে বোলো এখানে। পরদার আড়াল থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করব আমি।"

তার পরদিনই এসেছিলেন উদয়প্রতাপ। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করেনি মহারাণী। স্বর্ণখচিত আসনে বসতে দিয়েছিল তাঁকে, ভোজ্য এবং পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল সোনার বাসনে। যে ঘরে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল তার নিকষ-কৃষ্ণ মেজের উপর আলপনায় যে ছবিটি চিত্রিত ছিল তা দেখে একটু চমক লেগেছিল উদয়প্রতাপের, হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল এটা কি মহারাণীর কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত ? সারা মেজে জুড়ে একটা বিরাট সাপের সঙ্গে এক বিরাট ময়ূরের যুদ্ধের ছবি আঁকার মানে কি! ছবির অঙ্কন-কুশলতায় কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আতর এবং গোলাপজলের গন্ধ আমোদিত ক'রে রেখেছিল সারা ঘরটাকে। অলিন্দে, বাতায়নে, দেওয়ালে দুলছিল নানা বর্ণের অসংখ্য ফুলের মালা। ঘরের দুধারে দুটো দাঁড়ে বসে গা দোলাচ্ছিল দুটো অপরূপ কাকাতুয়া।

আহারাদি শেষ হবার পর রত্নালঙ্কৃত একটি পানের বাটা হাতে ক'রে ঢুকল মহারাণীর খাস পরিচারিকা শৌরসেনী। নম্র নমস্কার ক'রে পানের বাটাটি উদয়প্রতাপের সামনে নামিয়ে বলল, "ওই

পরদার আড়ালে মা এসে বসেছেন। আপনি যা বলবেন বলুন—" এই বলে' আবার নমস্কার ক'রে সে চলে গেল। সুসজ্জিত আরও দুটি পরিচারিকা, রঙ্গাবতী আর মোহিনী, আগে থেকেই পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল চামর হাতে নিয়ে।

উদয়প্রতাপ তাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরাও যাও, আমি যা বলব তা গোপনীয়।"

তারাও বাইরে চ'লে গেল। দ্বারে বিলম্বিত উজ্জ্বল চিক্কণ রেশমের পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের নিক্কণ। উদয়প্রতাপ প্রত্যাশা ভ'রে চাইলেন সেদিকে। অলঙ্কারের নিক্কণ আর একবার শোনা গেল, কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উদয়প্রতাপ তখন নিজেই কথা শুরু করলেন।

"আপনার কাকা বলেছিলেন চিঠির উত্তর নিয়ে যেতে। সে উত্তর কখন পাব?"

"উত্তর আমি পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে।"

"আমি কি কিছুই জানতে পারব না?"

"কি জানতে চান বলুন।"

"কি জানতে চাই তা কি আপনার অজানা আছে। যে আশা ক'রে এতদূর এসেছি তা কি পূর্ণ হবে না?"

পরদার ওপার থেকে কয়েক মুহূর্ত কোন উত্তর এল না। পরদাটা দুলে উঠল শুধু একবার। তারপর মহারাণীর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল।

"আমি ঠিক করেছি, বিয়ে করব না।"

"সে কি! এমন অস্বাভাবিক সঙ্কল্প কেন?"

"আমি তো ঠিক স্বাভাবিক নই। সকলে সাধারণত যা করে আমি তা করতে ভালবাসি না।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন, সাধারণ নিয়ম অনুসারে যদি চলতুম তাহ'লে আমাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতেই পেতেন না আপনি। জমিদারের বাড়ির

বৌ-ঝিরা সাধারণত বোরখা-ঢাকা পালকি চ'ড়ে গঙ্গাস্নানে যায়, গঙ্গায় নামবার আগে গঙ্গার ঘাট থেকে জল পর্যন্ত দুধারে কানাত পড়ে। আমি সেদিন খোলাখুলি ভাবেই গিয়েছিলাম—"

"সেই জন্যেই তো মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি অসাধারণ। নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, আমিও ঠিক সাধারণ লোক নই, তাই—"

"আপনার সব পরিচয় আমি জানি। আপনাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে আমার অন্দরমহলে আছে, তার কাছ থেকে সব শুনলাম।"

"কে বলুন তো?"

"সে নিজেকে গোপন রাখতে চায়।"

কথাটা শুনে চুপ ক'রে গেলেন উদয়প্রতাপ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়েই রইলেন খানিকক্ষণ।

"আমার বাসনা চরিতার্থ হবার কোন আশা নেই তাহলে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন, বিবাহ করবার ইচ্ছে আমার নেই।"

উদয়প্রতাপের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। চোখের কোণে এক ঝলক বহ্নিও চকমক ক'রে উঠল। জীবনে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করেছেন তিনি, অনেক দুর্ধর্ষ শত্রুর মাথা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে, সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবেন না কি! কিন্তু এটাও তিনি অনুভব করলেন, শক্তির হুঙ্কার বা বীরত্বের আস্ফালন বেমানান হবে এখন। মৃদু হেসে তাই তিনি যা করলেন, তা ঠিক অভিনয় নয়, মহারাণীর জন্য সত্যই উতলা হয়ে উঠেছিল তাঁর হৃদয়, কোমল গদগদ কণ্ঠে বললেন, "আমি মিনতি করছি।"

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আমিও মিনতি করছি, ক্ষমা করুন আমাকে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল উদয়প্রতাপের। নেপথ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে না কি? কোন প্রণয়ী? কিন্তু তখনই তাঁর মনে হ'ল এখন এ প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই এখানে। খোঁজ করতে হবে।

নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সহসা পরদার দিকে চেয়ে উদয়প্রতাপ বললেন, "হতাশ হয়েই ফিরতে হবে তাহলে ?"
"আবার বলছি ক্ষমা করুন আমাকে।"
এবার আর আত্ম-সম্বরণ করতে পারলেন না উদয়প্রতাপ।
বললেন, "ভিক্ষে ক'রে যা আজ পেলাম না, আশা রইল দাবীর জোরে তা একদিন নিয়ে যাব। চললুম—"
উঠে গেলেন তিনি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল ক্ষণকালের জন্য। পরদার ওপারে যেন বজ্রপাত হ'ল। গর্জন ক'রে উঠল মহারাজ। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন না ক'রে চ'লে গেলেন উদয়প্রতাপ।

এরপর আর বিবাহের প্রস্তাব আসেনি। তার সম্ভাবনাটুকুও রহিত হয়ে গেল। খবর এল পর্বতবিলাস কামাখ্যা পাহাড়ে মারা গেছেন। শোচনীয় সে মৃত্যু। কি এক তান্ত্রিক সাধনা করছিলেন সেখানে, হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ অবস্থায় লাফিয়ে পড়েছিলেন পাহাড় থেকে।

মহারাণী যথাকালে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'ল। এরপর মহারাণী-চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, তাতে অনেকে বিস্মিত হ'ল, অনেকে আবার সাধুবাদও করতে লাগল। অন্দরমহলের পুরাতন পুরুষ ভৃত্যেরা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন কোন পরিবর্তন বোঝা যায়নি, কিন্তু তারা যখন একে একে মারা যেতে লাগল তখন তাদের বদলে আর কোনও পুরুষ নিযুক্ত হ'ল না, নিযুক্ত হ'ল নারী। বাইরের মহলে অবশ্য পুরুষ চাকর না থাকলে চলে না। বরকন্দাজ, বেয়ারা, সহিসের কাজ মেয়েদের দ্বারা হয় না। তারা রইল। কিন্তু রইল বাইরের মহলে। হাতীর বুড়ো মাহুত রহিমের মৃত্যুর পর একজন মাদ্রাজী মেয়ে-মাহুতও জুটে

গেল মহারাণীর। রহিমের জায়গায় সে-ই বাহাল হ'ল। অর্থাৎ অন্দরমহলে বিনা অনুমতিতে কোন পুরুষের আর প্রবেশাধিকার রইল না। অবশ্য দুটি পুরুষ ছাড়া। একজন শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ, আর একজন গালুটির বড়বাবু মহেন্দ্রনাথ। মহারাণীর আমন্ত্রণে এঁরা প্রায় আসতেন অন্দরমহলে। অন্দরমহলের খিড়কি বাগানে কিন্তু প্রবর্তিত হ'ল বিপরীত নিয়ম, সেখান থেকে স্ত্রী-পশুগুলি অপসারিত হ'তে লাগল একে একে। ময়ূরী আর একটাও রইল না। বাঘ সিংহ একটা করেই ছিল এবং দুটোই ছিল পুরুষ। শেয়াল সজারু উদ্‌বিড়াল মরে যাবার পর আর কেনা হ'ল না। পাখী খরগোস রইল অবশ্য। পুরুষ পাখী পুরুষ খরগোস। কিন্তু বাঘ সিংহ আর ময়ূর এই তিনটে জানোয়ারই বেশী প্রিয় হয়ে উঠল মহারাণীর। কার্তিক আর রঘু মারা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। নূতন বাঁদর আর কেনা হয়নি, নূতন ময়ূর কিন্তু এসেছিল, পুরুষ ময়ূর। বাঘ সিংহ আর ময়ূরের জন্য আলাদা আলাদা মহলও করিয়ে দিল মহারাণী। এদের মহলে আর কেউ যেতে পেত না। কষ্টি শুধু যেত পরিষ্কার করবার জন্য, এদের বাকী সেবা যত্ন মহারাণী নিজেই করত—খেতে দিত, খেলা করত, এমন কি গল্পও করত এদের সঙ্গে। মহারাণীর অধিকাংশ সময়ই কাটত এদের নিয়ে। শৌরসেনী মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যেত, এদের কাছে যাবার আগে বিশেষ রকম প্রসাধনও করত মহারাণী। এক একটা মহলে একদিন, কখনও বা উপর্যুপরি দু'তিন দিন যেত সে। গিয়ে অনেকক্ষণ থাকত। আর সে সময় হ'ত এক অদ্ভুত কাণ্ড। অন্য মহল দুটোতে শুরু হ'ত গর্জন আর চীৎকার। মনে হ'ত যেন ঈর্ষা আর ক্ষোভের জ্বালায় ছটফট করছে ওরা। সিংহটা কম চেঁচাত, তার উপেক্ষার ভাব ছিল একটু, কিন্তু ময়ূর আর বাঘ ক্ষেপে উঠত যেন। প্রত্যেক মহল থেকে প্রত্যেক মহলের ভিতর পর্যন্ত দেখা যেত। এই সব চীৎকার চেঁচামেচি নিবারণের জন্য

পরদার ব্যবস্থা করেছিল মহারাণী। যে মহলে মহারাণী ঢুকত সে মহলের চারিদিকে পরদা ফেলে দেওয়া হ'ত। এতেও কিন্তু মনোমত ফল হয়নি। একটা মহলে লুকিয়ে ঢুকলেও অন্য মহলের অধিবাসীরা টের পেয়ে যেত, আর প্রতিবাদও জানাত তার-স্বরে। ফলে খিড়কি-বাগানের বায়ু-মণ্ডল ময়ূরের কেকায়, বাঘের গর্জনে এবং সিংহের মন্দ্র-নিনাদে স্পন্দিত হ'ত প্রায় প্রতিদিন। বাইরের আশ-পাশের লোকেরা ভয় পেত, অবাক হ'ত। নানারকম গুজব রটেছিল এই নিয়ে। কিন্তু ঠিক খবরটি কেউ জানত না, কারণ জানবার উপায় ছিল না। বাইরে থেকে অন্দরমহলে আসতে পেত না কেউ, অন্দরমহলবাসিনীরাও বাইরে যেত না, খিড়কির বাগানে যাবারও অনুমতি ছিল না তাদের। সুতরাং তারাও ঠিক খবরটি জানত না। খবরটি জানত শুধু কৃষ্ণাঙ্গিনী কষ্টি। কিন্তু সে বাংলা বুঝত, কিন্তু বলতে পারত না। তাছাড়া সে ভাল ক'রে মিশতেও পারত না কারো সঙ্গে। বাগানের একপ্রান্তে যেখানে হেলে-পড়া আমগাছটাকে কেন্দ্র ক'রে ঝোপ জঙ্গল গজিয়েছিল সেইখানে একটা ছোট ঘর বানিয়ে একা একা থাকত সে, তার একমাত্র কাজ ছিল মহারাণীর সামনে দাঁড়িয়ে ময়ূর, বাঘ আর সিংহের ঘরগুলো পরিষ্কার করা আর মহারাণীর খেয়াল-খুশী মতো সং সাজা। মহারাণী কখনও তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখত, কখনও বলত চোখ বুজে জিব বার ক'রে বসে থাকতে, কখনও তুহাত তুলিয়ে বসিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে জুলু ভাষায় কঙ্গো দেশের গান গাইত সে একা গাছের উপর বসে। কারও সঙ্গে মিশত না, তাই যা সে জানত তা বাইরে প্রচার করবার সুযোগ ছিল না।···আর একটি কাজও করেছিল মহারাণী। শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। ওই খিড়কির বাগানের একধারেই হয়েছিল মন্দিরটি। সুদূর রাজপুতানা থেকে এসেছিল শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গটি। মিস্ত্রি মজুরও এসেছিল রাজপুতানা থেকে। এর জন্যে কোনও

পুরোহিত বাহাল হয়নি। মহারাণী নিজেই পূজো করত, এমন কি মন্দিরও পরিষ্কার করত সে নিজেই। চন্দন-গোলা জল দিয়ে মুছত ঘরের মেজে। স্বহস্তে ঘি মাখন চন্দন মাখাত শিব-লিঙ্গে, তারপর ছুধে স্নান করাত তাকে। এই নিয়েও অনেকক্ষণ সময় কাটত তার। যারা বাইরে থেকে পশুদের চীৎকার শুনত তাদের মধ্যে যারা কল্পনা-কুশল তাদের ধারণা হয়েছিল এই চীৎকারের কারণ ওই শিবলিঙ্গ। তারা কল্পনা করত মহারাণীর সঙ্গে ওই পশুরাও বন্দনা করছে পশুপতিকে নিজ নিজ ভাষায়। সেইজন্য পশুদের চীৎকার উঠলেই দেখা যেত বাইরে অনেকে নমস্কার করছে।

পশুরা কেন চীৎকার করে তা কষ্টি অবশ্য জানত। কিন্তু সে এর অর্থ করেছিল নিজের সংস্কার অনুসারে। সে মহারাণীকে সাধারণ মানবী ব'লে মনেই করত না। আফ্রিকার আদিবাসিনী সে, তার সংস্কার তাকে ব'লে দিয়েছিল এই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা তন্বীটি সেই জাতের মেয়ে যে জাতের ছিল এলোকেশী টকুমা। টকুমাকে সে ভোলেনি। গভীর অরণ্যবাসিনী টকুমা থাকত সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে, বেবুন শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দোল খেত বনস্পতির ডালে ডালে। তার কুঞ্চিত আলুলায়িত কৃষ্ণ চিকুরে সাধারণ তেল পড়ত না কখনও, তবু কিন্তু রুক্ষ ছিল না তা, চুলে সাপের চর্বি মাখাত সে। সে যখন দোল খেত তার চুলের গোছা দেখে মনে হ'ত একগোছা সর্পশিশু যেন ফণা তুলে ছুলছে তার পিঠের উপর। তার কাছে ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে যেত অনেকে। তার বাবা একবার গিয়েছিল, কষ্টিও সঙ্গে ছিল। তার কাছে যেতে হলে একটা নেউল নিয়ে যেতে হ'ত। সেই নেউলটির গলা কেটে সে টাঙিয়ে দিত অগ্নি-কুণ্ডের উপর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ত অগ্নিকুণ্ডে, ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে শব্দ হ'ত, ধোঁয়া উঠত কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেই ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত টকুমা। কখনও হাসত হি হি ক'রে, ফুঁপিয়ে কাঁদত কখনও, কখনও আবার ছু'হাত তুলে নাচত। আচ্ছন্নের

মতো হ'য়ে যেত খানিকক্ষণ, সেই অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করত সে। যা বলত তা ফ'লে যেত। সে ব'লে দিয়েছিল তার বাবা প্রাণ হারাবে সিংহের কবলে, ব'লে দিয়েছিল তার জীবন কাটবে সমুদ্র-পথে এক বিদেশিনী শক্তিময়ী নারীর অধীনে। সব ফ'লে গেছে। কষ্টির দৃঢ় বিশ্বাস মহারাণীও টকুমার মতো শক্তিশালিনী। সে স্বচক্ষে দেখেছে টকুমার মতো মহারাণীও সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে থাকে, বিশেষ ক'রে যখন সে পশুদের কাছে যায়। ওই পশুদের সে বশ করেছে যে শক্তি বলে তা সাধারণ স্ত্রীলোকের থাকতে পারে না। ময়ুর বাঘ আর সিংহকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড করে মহারাণী যা অদ্ভুত। অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে কষ্টি। মহারাণীর সামনে ময়ুরটা যখন পেখম তুলে নৃত্য করে তখন মনে হয় মহারাণী যেন মানবী নয় ময়ুরী। আবার বাঘের ঘরে তাকে মনে হয় বাঘিনী। প্রকাণ্ড বাঘটা তার কাঁধের উপর সামনের ছুই থাবা রেখে তাকে যেন আদর করতে চায়। মহারাণীর ঘাড়ে মাথা রেখে যে অস্ফুট শব্দ সে করতে থাকে তা ঠিক যেন প্রেমালাপের মতো শোনায়। সিংহটাকে অবশ্য অত চাপল্য প্রকাশ করতে দেখেনি কষ্টি, কিন্তু মহারাণী যখন সিংহের পিঠের উপর চ'ড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তখন মনে হয় তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে, কেশরগুলো ফুলে ওঠে, জ্বল জ্বল করতে থাকে চোখের দৃষ্টি, পুচ্ছের আন্দোলন দেখে মনে হয়, এই বুঝি আত্মসংযম হারাল সে। কিন্তু হারায় না। গম্ভীর হয়ে সহ্য করে সে মহারাণীর উচ্ছ্বসিত সোহাগ-অত্যাচার। মাঝে মাঝে কেবল মৃত্নু গর্জন করে, মনে হয় মেঘ ডাকছে বহু দূরে। পশুরাজ নিজের শালীনতা হারায়নি, অসংযত হয়নি কখনও। বাঘের মতো পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে আলিঙ্গন করবার চেষ্টা করেনি মহারাণীকে, কোন অশোভন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়নি তার আচরণে। কিন্তু সিংহের এই উপেক্ষা মহারাণীর যেন পছন্দ হ'ত না। মহারাণী চাইত ময়ুর আর বাঘের মতো সে-ও উতলা হ'য়ে উঠুক। কিন্তু সে হ'ত না।

কেশর ফুলিয়ে ব'সে থাকত চুপ ক'রে। কষ্টির বিশ্বাস এজন্য অভিমান হ'ত মহারাণীর। রাগ ক'রে উপর্যুপরি দু'তিন দিন সে যেত না সিংহের মহলে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আদর করত ময়ূরকে, চুমু খেত বাঘের গালে। সিংহ ঘাড় ফিরিয়ে দেখত সব, মাঝে মাঝে গর্জন করেও উঠত। কিন্তু মহারাণী ফিরে এলে আবার গম্ভীর হয়ে বসে থাকত একধারে। কেশর ফুলিয়ে ল্যাজ নাড়ত খালি। প্রগল্‌ভ হয়ে উঠত না কখনও। মহারাণীর আর একটা আচরণে বিস্মিত হয়েছিল কষ্টি। প্রতি অমাবস্যায় মহারাণী বাইরের কালীমন্দিরে পূজো দিতে যেত। একদিন কষ্টিও গিয়েছিল। কালী প্রতিমা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। করালবদনা ভীষণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা প্রতিমার সামনে মহারাণীকে প্রণতা দেখে তার মনে হয়েছিল এই দেবতাই বোধহয় মহারাণীর শক্তির উৎস। এই দেবতাকে সে-ও মনে মনে ভক্তি করতে শুরু করেছিল। একদিন মহারাণী দেখে অবাক হয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে কষ্টি মা কালীর মতো উলঙ্গিনী হয়ে হাত তুলে জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা কালীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ওরকম করেছিল সম্ভবত।

এইভাবেই দিন কাটছিল মহারাণীর। তার বাবার জমিদারির মালিক হয়নি সে কোনদিন, সে হয়েছিল নিজের সৃষ্ট জগতের অধিশ্বরী। জমিদারির ভার নিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তিনি যা করতেন তাই হ'ত। আইনত মহারাণী সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন তাঁর হাতে। বিষয়ের ঝামেলা ভালই লাগত না তার। সে নিমগ্ন থাকত নিজেকে নিয়ে খিড়কির বাগানে, হয় পশুদের মহলে, না হয় শিবমন্দিরে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত অশ্বারোহণে বা হাতীর পিঠে চ'ড়ে। মাদ্রাজিনী মাহুত হাতী হাঁকাত।

অন্দরমহলে আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল, অনেক ছিল, তাদের সঙ্গে

বিশেষ যোগ ছিল না তার। শান্ত পিসি মারা গিয়েছিলেন। সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর তাঁর দেখন-হাসি শুকতারাও চলে গিয়েছিলেন তাঁর আর এক ঠাকুরপোর কাছে। কাত্যায়ণী বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনি স্থবির হয়ে পড়েছিলেন, চোখেও দেখতে পেতেন না ভালো। সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় পক্ষের বন্ধ্যা বিধবা কুসুম সেবা করত তাঁর। সমুদ্রবিলাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সিন্ধুবালাও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁকে বৃন্দাবন-বাস করতে হচ্ছিল। মহেন্দ্রনাথ তাঁকে যেতে বাধ্য করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর সঙ্গত কারণও ছিল। সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর বছর তিনেক পরে তিনি একটি সন্তান প্রসব করলেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে সমুদ্রবিলাসের জীবদ্দশাতেই তাঁর গর্ভ-লক্ষণ প্রকট হয়েছিল, সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হ'তে কেন যে এত দেরি করল তা তিনি জানেন না। তবে এ বিষয়ে তিনি একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন কোনও তান্ত্রিকের সহায়তায় তাঁর শত্রুপক্ষেরা (মানে, মহারাণী এবং ছোটবউ কুসুম) তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণকে নাকি হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর সতীত্বের জোরে ওদের চক্রান্ত সফল হয়নি। সেই ভ্রূণ তাঁর গর্ভে এতকাল বাল্মিকীর মতো তপস্যা করছিল, তপস্যা শেষ ক'রে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সমুদ্রবিলাসের বিষয়ের সেই ন্যায্য উত্তরাধিকারী। একথা কেউ যদি না মানে তাহলে দরকার হ'লে তিনি মকোর্দমা করবেন। তাঁর দলে লোকও জুটে গিয়েছিল বিস্তর। মহেন্দ্রনাথ একদিন এসে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি যা বলেছেন তা হয়তো ঠিক, কত অসম্ভব জিনিসই তো সম্ভব হয় পৃথিবীতে, কিন্তু ব্যাপারটা এতই আজগুবি যে ইংরেজের আদালতে ওসব বিশ্বাস করবে না। তিনি মকোর্দমা করলে হেরে যাবেন এবং হেরে যাবার পর তাঁর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়বে, কারণ তখন তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সহানুভূতিও হারাবেন। তার চেয়ে

মোটারকম মাসোহারা নিয়ে তীর্থ-বাস করাই ভালো। সমুদ্রবিলাসের পত্নী যাতে সেখানে উপযুক্ত মর্যাদায় থাকতে পারেন স্টেট থেকে সে ব্যবস্থা করা হবে। অনেক ভেবে চিন্তে সিন্ধুবালা শেষে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবন থেকে এমন এক একটি চিঠি লিখতেন যাতে গোপনে গোপনে সাড়া প'ড়ে যেত অন্দরমহলে। আর সে মহল নিতান্ত ছোট ছিল না। রক্তের সম্পর্কে, গ্রাম-সম্পর্কে, জ্ঞাতিত্বের দাবীতে, বন্ধুত্বের সুবাদে, নানা বয়সের বহু নর-নারী পুরাসিনী হয়ে থাকত মহারাণীর অন্তঃপুরে। তাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলিও ছিল, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নানা উপায়ে তারা চিত্তবিনোদনের উপকরণ সংগ্রহ করত। ঝগড়া করত, ভাব করত, ঘৃণা করত, ভালবাসত। সমুদ্রবিলাসের পিতৃপুরুষদের স্থাপিত মন্দিরগুলিতে পুজো দিত। আলাদা একটা সমাজই গড়ে উঠেছিল অন্দরমহলে। এদের মধ্যে একটা দল ছিল সিন্ধুবালার পক্ষে। তারা সামনে যদিও মহারাণীর মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করত কিন্তু মনে মনে আশা ক'রে থাকত (কামনাও করত), যে সিন্ধুবালা একদা সহসা বৃন্দাবন থেকে তার বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে এসে হাজির হবেন এবং মহারাণীর দর্প চূর্ণ ক'রে দেবেন। এদের দলের নেত্রী ছিল মোনার মা। রোগা, ফরসা, বিধবা, খুব মুখ-মিষ্টি, খুব নিষ্ঠাবতী, পুরুষের ছায়ামাত্র দেখলে লম্বা ঘোমটা টেনে দিত, সিংহবাহিনীর সমস্ত মন্দিরের চত্বরটা নিজে হাতে পুঁছত রোজ, কিন্তু মহারাণীর ঘোর শত্রু ছিল সে। তার দলে ছিল, জিরেগাঁয়ের উলকি (সম্পর্কে মহারাণীর মাসী), গৌর পিসি আর গোবরার মা। এদেরও বিপক্ষ দল ছিল একটা। সে দলের নেতৃত্ব করতেন সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় পত্নী কুসুমকুমারী। তাঁর দলে ছিল ওই জিরেগাঁয়েরই মুকুজ্যে গিন্নি (এও সম্পর্কে মহারাণীর মাসী), সাবিত্রী খুড়ি, যমুনার মা আর সাতু। সবাই আত্মীয়। কুসুম মহারাণীর চেয়ে বছর দু'য়েকের বড়, রূপসী এবং যৌবন-সমৃদ্ধা।

ইনি মহারাণীকে সুনজরে দেখতেন না। কুঞ্জনাথ রায় নামে তাঁর এক ঘাড়ে-গর্দানে কাকা মাঝে মাঝে আসতেন এবং এদিক ওদিক চাইতে চাইতে তাঁর ঘরে বসে নিম্নস্বরে কি সব ফুসফুস গুজগুজ করতেন। শোনা যেত তিনি নাকি সমুদ্রবিলাসের বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ কুসুমের জন্য দাবী ক'রে সদরে আর্জি পেশ করেছেন। শীঘ্রই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে লোক আসবে। এই রকম নানা ধরণের ষড়যন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে অন্দরমহলের বিভিন্ন দল জীবনের আস্বাদ পাবার চেষ্টা করত। আর একটা অবলম্বন ছিল, কুৎসা আর কেলেঙ্কারী। মহারাণী যদিও অন্দরমহলে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু তবু নাকি পুরুষ আসত, রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে। একবার একটা সুড়ঙ্গও নাকি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এসব নিয়েও নানা রঙের ঘটনা, গুজব, উত্তেজনা, আশঙ্কা আলো-ছায়া বিস্তার করত মহারাণীর অন্দরমহলে। মহারাণীও তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ত না। নানারকম অদ্ভুত আলোচনা হ'ত তার সম্বন্ধে। এমন কথাও কেউ কেউ বলত যে মহারাণী যে শিবলিঙ্গটি স্থাপন করেছে এবং যার পরিচর্যার ভার সে আর কারও হাতে দিতে চায় না, সে শিবলিঙ্গটি নাকি ফাঁপা, তার উপরের অংশটি খোলা যায় এবং তার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গেরও নাকি যোগ আছে। প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ কারও ছিল না, মহারাণীর সঙ্গে আলাপ সূত্রে কিছু বার ক'রে নেবার সুযোগও ছিল না। মহারাণী একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে বাস করত নিজের মহলে। তার মহলের দাসী চাকরাণীরা পর্যন্ত অন্দরমহলের আর কারও সঙ্গে মিশত না। সম্ভবত মহারাণীর কোন ইঙ্গিত ছিল এতে। ফলে এই দাঁড়িয়েছিল যে যদিও তারা মহারাণীর অর্থেই প্রতিপালিত হ'ত কিন্তু মহারাণীকে ভালবাসত না কেউ। মহারাণী নিজের চারদিকে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। নানা লোকে নানা কথা ভাবত। কষ্টি

মনে করত মহারাণী অতি-মানবী, পাঁচার মা ভাবত সময়ে বিয়ে হ'ল না বলেই ও অমন মন-মরা হয়ে একা একা থাকে, আর বাকী সকলের ধারণা ছিল ও অহঙ্কারী। এত বড় বিষয়ের অধিশ্বরী হয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সাধারণ মানুষকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

মহারাণীর এই রহস্যময় জীবনযাত্রার আসল হেতুটা বোধ হয় জানতেন শ্রীহর্ষ, সবটা জানতেন না, আভাসে কিছুটা জানতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর সঙ্গে মহারাণীর যে সামাজিক বন্ধনটা হব-হব করেও শেষ পর্যন্ত হ'ল না, অথচ যা হয়নি বলেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে, সেইটেই বোধহয় আসল কারণ। অথচ কি-ই বা করতে পারতেন তিনি এর চেয়ে বেশী। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।

শ্রীহর্ষ যখন টোলের পাঠ সমাপ্ত ক'রে সসম্মানে কাব্যতীর্থ হলেন তখন ভবভূতি ভট্টাচার্য ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। ভাল বংশ, ভাল ছেলে, নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। সর্বমঙ্গলাকে তিনি পছন্দ ক'রে এলেম। আশীর্বাদ ক'রে পাকা কথা দেওয়ার আগে তাঁর মনে হ'ল ছেলে সাবালক হয়েছে, তার মতটা নেওয়া উচিত।

মত নিতে গিয়ে কিন্তু বিপদে প'ড়ে গেলেন তিনি।

শ্রীহর্ষ বললেন, "আমি বিয়ে করব না।"

"বিয়ে করবে না! আমার একমাত্র ছেলে তুমি, বিয়ে করবে না মানে?"

এ প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। তারপর আমতা আমতা ক'রে বললেন, "এ বিষয়ে আমি এখনও মন-স্থির করতে পারিনি। আমাকে মন-স্থির করবার জন্যে কিছু সময় দিন। মনে হচ্ছে এখন বিয়ে করলে আমি অসুখী হব।"

ভবভূতি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার চোখে মুখে একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপর মনে হ'ল ও কিছু একটা লুকোতে চেষ্টা করছে, কিসের জন্য অমন ক'রে আছে ও! তারপর সহসা বুঝতে পারলেন।

"বিশেষ কোন মেয়েকে পছন্দ হয়েছে না কি তোমার ?"

আনত নয়নে চুপ ক'রে রইলেন শ্রীহর্ষ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মৃদুকণ্ঠে উত্তরটা দিলেন তির্যকভাবে।

"মহারাণী ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠতা হয়নি আমার।"

"মহারাণীকে বিয়ে করতে চাও ?"

শ্রীহর্ষ চুপ ক'রে রইলেন।

ভবভূতি বললেন, "আমার আপত্তি নেই। সমুদ্র যখন এ প্রস্তাব করেছিল আমি আপত্তি করিনি। তুমিই আপত্তি করেছিলে, তারপর শুনেছি মহারাণীও আপত্তি করেছিল। এখন তোমাদের দুজনের মত যদি বদলে থাকে আমি দাঁড়িয়ে বিয়ে দেব, নিজের স্বার্থের জন্য তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায় হব না। কিন্তু একথাটাও আমি বলে দিচ্ছি পিতৃ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে আমি কিম্বা তোমার মা পুত্রবধূর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারব না।"

"তা থাকবেন কেন, এ প্রশ্ন উঠছে কি ক'রে ?"

"তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে। দাসখৎ লিখে দিতে হবে একেবারে। মহারাণী আমাদের বাড়িতে আসবে না। এলেও মানাবে না।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীহর্ষ।

ভবভূতি বললেন, "মহারাণীর সঙ্গে এ বিষয়ে তুমি কথা ব'লে দেখতে পার, তোমার অমতে কিছু করতে চাই না।"

বিবাহের প্রস্তাব ভেঙে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীহর্ষ মহারাণীর কাছে যাননি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন যাওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মহারাণীর কথা এক মুহূর্ত ভুলতে

পারেননি তিনি। অদর্শনটা যেন আরও নিবিড় ক'রে তুলেছিল তাঁর অনুভূতিকে। তিনি বুঝতে পারেননি মহারাণী কেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাল্যকাল থেকে মহারাণীর সঙ্গে মিশে যে ধারণাটা তাঁর মনে গ'ড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেক জ্যোৎস্না রাতের স্মৃতি, অনেক ফুলের গন্ধ, অনেক মান-অভিমান, আবদারের মাধুর্য। কত ছোট-খাটো-খুঁটি-নাটি-খেয়াল-খুশীর রত্ন-কণিকা, যে ধারণার মধ্যে বিরহের কোন সম্ভাবনাও ছায়াপাত করেনি কোনদিন, সেই স্বপ্নময় ধারণাটা প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে হঠাৎ যখন বদলে গেল, তখন কষ্ট পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ, কিন্তু একেবারে হতাশ হননি। ভেবেছিলেন ওটা মহারাণীর ক্ষণিকের খেয়াল হয়তো। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন শুনলেন গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্বন্ধ হচ্ছে, নিজের চোখে যখন দেখলেন স্বয়ং পর্বতবিলাস সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চ'ড়ে গালুটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এই জন্য, তখন মনে মনে এতদিন যেটাকে সোনা ব'লে ভেবেছিলেন সেটা পিতলে পরিণত হয়ে গেল হঠাৎ। গালুটির বড় তরফ যে এ বিবাহ দিতে উৎসুক সে খবরও পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ। মহেন্দ্রনাথের আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্য বিবাহটা কিন্তু স্থগিত হয়ে গেল। শ্রীহর্ষ ভাবলেন মহেন্দ্রনাথ যেদিন ফিরে আসবেন সেইদিনই বিবাহটা হবে। স্বপ্নের আকাশচুম্বী প্রাসাদটা সম্পূর্ণরূপে চুরমার হয়ে যাবে সেদিন। ইতিমধ্যে সমুদ্রবিলাস মারা গেলেন। তার কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথও ফিরে এলেন, কালাশৌচ কেটে গেল, শ্রীহর্ষ প্রতিদিনই আশা করতে লাগলেন এইবার বিয়ের বাজনা বেজে উঠবে, কিন্তু বাজল না। তারপর অসম্ভবই যেন সম্ভব হ'ল একদিন, যে সোনাটা পিতল হয়ে গিয়েছিল তাতেই আবার সোনালি রং ধরল। মহারাণীর এক দাসী এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। ছোট চিঠি।

"অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। একেবারে ভুলে গেলে না কি। কাব্য চর্চা করার ফাঁকে যদি ইচ্ছে হয়, এস একদিন।"

তখনও শ্রীহর্ষ উপাধি পরীক্ষায় উত্তী হননি। তার পরদিনই অনধ্যায় ছিল। দাসীকে ব'লে দিলেন, বলে দিও, কাল দুপুরে যাব। তখন বর্ষাকাল। দুপুরেও রাত্রির মায়া নেমেছে, আকাশে থমথম করছে মেঘ, স্নিগ্ধ কোমল হয়েএসেছে সূর্যালোক, অঞ্জন পরেছে আকাশ বাতাস।... মহারাণী ছিল নিজের মহলে দ্বিতলের অলিন্দে। দাসী সেইখানে নিয়ে গেল শ্রীহর্ষকে। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল তিনি যেন কুবেরের অলকাপুরীতে এসেছেন। প্রতি বাতায়নে দুলছে কদম্ব মালিকা, প্রতি বাতায়নের নীচে সুদৃশ্য ধূপাধার থেকে বিকিরিত হচ্ছে চন্দন-গুগ্‌গুলের সুরভি, অলিন্দের মাঝখানে এক বিরাট শ্বেতমর্মরের পুষ্পাধারে রয়েছে কেয়ার গুচ্ছ, অবগুণ্ঠিত পিঞ্জরের ভিতরে থেকে শিস দিচ্ছে শ্যামা। সুদীর্ঘ অলিন্দের একপ্রান্তে নীল মখমলের চুম্‌কি-খচিত আসনে ব'সে শৌরসেনী মালা গাঁথছে, আর এক প্রান্তে মহারাণী ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে একটা ফুলের দোলনায়, বিরাট একটা আয়নার সামনে। আয়নার কাচটা নীল, নীল অথচ স্বচ্ছ, মনে হচ্ছে নীল মেঘের উপর দুলছে যেন মহারাণী। শ্রীহর্ষ অবাক হয়ে গেলেন, একটু অসহায়ও বোধ করলেন। যে মহারাণীকে তিনি জানতেন এ তো সে নয়, এ যে সত্যিই মহারাণী, সম্রাজ্ঞী! এর নাগাল কি পাবেন তিনি?

শ্রীহর্ষকে দেখেই দোলনা থেকে মহারাণী নেমে এল।

"কি আশ্চর্য, কত বদলে গেছ তুমি, এত ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, এমন বাবরি। ভীড়ের মধ্যে দেখলে চিনতে পারতাম না। মহারাজের মতো অনেকটা দেখতে হয়েছে তোমাকে।"

"মহারাজ কে?"

"আমার পোষা সিংহটা। বস, বস, কোথায় বসাই তোমাকে—"

ব্যস্ত হয়ে উঠল মহারাণী। শৌরসেনী ঘরের ভেতর থেকে মীনা-কাজ-করা রূপোর চৌকি এনে দিলে একটা। এনে দিয়ে আবার যেমন মালা গাঁথছিল, তেমনি গাঁথতে লাগল।

শ্রীহর্ষ বললেন, "তুমি বসবে না ?"

"এই যে বসছি।"

দোলনায় গিয়ে উঠল মহারাণী, শ্রীহর্ষ সসঙ্কোচে বসলেন রূপোর চৌকিতে।

"আমাকে ডেকেছিলে কেন, কোন দরকার আছে ?"

"দরকার আর কি, অনেকদিন দেখিনি তাই।"

মহারাণী দুলতে লাগল ধীরে ধীরে। আয়নার প্রতিবিম্বটাও দুলতে লাগল। শ্রীহর্ষ এতক্ষণ মহারাণীর দিকে চেয়ে দেখতে পারেননি ভালো ক'রে। এইবার চাইলেন। দেখলেন মহারাণী তার দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, যেন দুটো মণি জ্বলছে। চোখোচোখি হ'তেই মহারাণী বলল, "মনে আছে ছেলেবেলার সেই দোলনাটাকে ? শিরিষ গাছটা ম'রে গেছে, কিন্তু দোলনাটা আছে এখনও। এইটেই সেই দোলনাটা, সেইটেকেই ফুল দিয়ে সাজিয়েছি। দুলব একটু ?"

"দোল।"

সাঁ ক'রে দোলনাটা সামনে দিয়ে চ'লে গেল অলিন্দের আর এক প্রান্তে। মহারাণীর ওড়নার সুরভিত প্রান্তটুকু শ্রীহর্ষের ললাট স্পর্শ ক'রে গেল। অপর প্রান্তে গিয়ে মহারাণী শৌরসেনীকে বলল, "শরবৎ নিয়ে আয়—"

কয়েকবার দোলনাটা আনাগোনা করল শ্রীহর্ষের চোখের সামনে দিয়ে। প্রতিবারই ওড়নার স্পর্শ লাগল। শ্রীহর্ষ নিজের হাস্যকর পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছিলেন, তবু তাঁর ভালো লাগছিল, তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে দোলনা থামিয়ে নেমে এল মহারাণী।

"জান, আমি যখন দোলনায় দুলি তখন সবাই দেখতে পায় সেটা। যখন দোলনায় থাকি না, তখনও আমার দোলনা থামে না, সেটা কিন্তু দেখতে পায় না কেউ।"

"সেটা কি রকম ?"

"মনে মনে দুলি। অনবরত দুলছি। তুমিও এককালে দুলতে। এখন বোধ হয় থেমে গেছ, জানি না ঠিক।"

"থামা যায় কি ? সারা বিশ্বটাই যে দুলছে।"

শৌরসেনী আরও দু'জন দাসীর সঙ্গে এল ফল, মিষ্টান্ন আর শরবৎ নিয়ে।

এরপর অতি সাধারণ সুরেই চলতে লাগল কথাবার্তা।

হঠাৎ কিন্তু বেসুরো হয়ে গেল শেষকালে।

যাওয়ার সময় মহারাণী বলল, "আবার এস, যখন খুশি এস—"

"যখনই ডাকবে তখনই সাড়া পাবে।"

"ডাকতে হবে ?"

এর উত্তরে শ্রীহর্ষ কিছু বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু।

মহারাণী অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হ'ল সহসা।

"আচ্ছা, তুমি তো অনেক ভাল ভাল কাব্য পড়েছ, না ?"

"পড়েছি কিছু কিছু।"

"আমাকে প'ড়ে শোনাবে ? শুধু শোনালেই হবে না, মানেও বলে দিতে হবে। সংস্কৃত ভুলে গেছি, সেই কবে পড়েছিলাম।"

"বেশ। বর্ষাকালে মেঘদূত জমবে ভাল।"

"কাল থেকেই শুরু কর তাহলে।"

"কাল থেকেই ?"

"হ্যাঁ কাল থেকেই।"

চুপ ক'রে রইলেন শ্রীহর্ষ।

"চুপ ক'রে আছ কেন, বল কাল থেকেই আসব।"

আদেশের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল মহারাণীর কণ্ঠে।

"কাল থেকে পারব না। জরুরি কাজ আছে কয়েকটা। আসব কয়েক দিন পরে।"

মহারাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

"আসতে হবে না তোমাকে।"

হঠাৎ ঘরের ভিতর চ'লে গেল মহারাণী।

দ্বার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিস্মিত শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে চলে গেলেন। এই কথাটিই ভাবতে ভাবতে গেলেন, "কতদিন পরে মহারাণীকে আজ প্রথম দেখলাম। বাইরেটা বদলেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও ঠিক তেমনি অভিমানী আছে দেখছি। একটুও বদলায়নি—" সমস্ত মনটা মাধুর্যে ভ'রে গেল তাঁর।

দিন কয়েক পরে এক মেঘ-স্নিগ্ধ প্রভাতে মেঘদূত নিয়ে আবার যেতে হয়েছিল শ্রীহর্ষকে। মহারাণীর চিঠি নিয়ে আবার দাসী গিয়েছিল তাঁর কাছে। শ্রীহর্ষ অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন চিঠিখানার দিকে।

"কই, মেঘদূত নিয়ে তুমি তো এলে না। বর্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন মহারাণী খিড়কির বাগানের পশ্চিম প্রান্তে এক দূর্বা-শ্যামল প্রাঙ্গনে অনেক শাদা খরগোস পরিবৃত হয়ে বসে আছে। শৌরসেনীও রয়েছে সেখানে। খরগোসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

"এইখানে বসে শুনবে?"

"কেন, এখানে হবে না?"

"তুমি তো ব্যস্ত আছ দেখছি খরগোস নিয়ে, মেঘদূতে মন দিতে পারবে?"

"খুব। পড়তেই আরম্ভ কর না। তুমি পড়বে আর আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব, সেটা কি ভালো দেখাবে, তা আমি পারবও না।"

শৌরসেনী একটি আসন পেতে দিল ঘাসের উপর। আরম্ভ হ'ল মেঘদূতপাঠ। শ্রীহর্ষের মনে হতে লাগল মহারাণী শুনছে না মন দিয়ে। শ্রীহর্ষ যখন পড়ছিল তখন সে কখনও একটা খরগোসকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিল, কখনও বা আর একটার মুখে ঘাস তুলে দিচ্ছিল, কখনও বা উঠে গিয়ে ধ'রে আনছিল আর একটাকে। শ্রীহর্ষ বিরক্ত হচ্ছিলেন মনে মনে, কিন্তু প'ড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি প্রমাণ পেলেন মহারাণী শুনছে। পূর্ব-মেঘের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করছিলেন তিনি—"তুমি পবন-পথে আরূঢ় হ'লে পথিক বধূগণ আশ্বস্ত হবে, কপাল থেকে অলকদাম সরিয়ে তোমাকে বিশ্বাস ভ'রে নিরীক্ষণ করবে। তাদের আশা হবে এইবার তাদের স্বামীদের প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে, বর্ষাকালে তারা আর দেশ পর্যটন করতে পারবে না। আমার মতো যে পরাধীন নয়, সে কি তোমাকে আকাশে সমুদিত দেখে বিরহ-বিধুরা জায়াকে উপেক্ষা করতে পারে?"

"পদবী মানে কি পথ?"

"হ্যাঁ।"

একটা খরগোসকে বুকে চেপে ধ'রে মহারাণী বলল, "তোমার কখনও হয়েছে ও রকম?"

"কি রকম?"

"মেঘ দেখে বিরহ-বিধুরা প্রিয়াকে মনে পড়েছে?"

"কালিদাস তো প্রিয়ার কথা লেখেননি। লিখেছেন বিরহ-বিধুরা জায়াং। আমার তো জায়া হয়নি এখনও।"

"ও, জায়া আর প্রিয়া বুঝি এক নয়? আমারই ভুল হয়েছিল, পড়।"

শ্রীহর্ষ পড়তে লাগলেন, মহারাণী অধর দংশন ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুনতে লাগল। এই ঘটনাটা শ্রীহর্ষের মনে আঁকা হয়ে আছে এখনও। উপর্যুপরি কয়েকদিনই চলেছিল মেঘদূত-পাঠ।

উত্তর-মেঘ পড়ার সময় মুচকি হেসে মহারাণী আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—"আচ্ছা, কালিদাস যাঁর বিরহের ছবি এঁকেছেন তিনি কি কখনও বিয়ে-করা গেরস্থ ঘরের বউ হতে পারেন? ময়লা কাপড় প'রে, রুক্ষ চুলে, কোলে বীণা নিয়ে যিনি নির্বাসিত যক্ষের নাম-গান করছেন, চোখের জলে বীণার তাঁত পিছল হয়ে যাচ্ছে তবু যিনি তাতে মূর্ছনা তোলবার প্রয়াস পাচ্ছেন, যিনি দুঃখে শীর্ণা হয়ে এক-কাতে শুয়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন, যিনি এত কাণ্ড করছেন তাঁকে কি গেরস্থর বউ ব'লে মনে হয়? আমার বিশ্বাস উনি যক্ষ-প্রিয়া, যক্ষ-জায়া নন—"

"তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মহারাণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সে।

এ ছবিটাও ভোলেননি শ্রীহর্ষ। আরও অনেক ছবি আঁকা আছে তাঁর মনে। মেঘদূত-পর্বের পর আরও অনেকবার মহারাণী আমন্ত্রণ করেছে তাঁকে। অনেক স্বর্ণোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর, অনেক বর্ণ-বিচিত্র সন্ধ্যা কাটিয়েছেন তিনি মহারাণীর সঙ্গে; একটা কথা বারবার মনে হয়েছে যদিও—মহারাণী একেবারে একা দেখা করে না কেন, কাছে-পিঠে হয় শৌরসেনী, না হয় আর কেউ থাকে কেন—? তাই বিবাহ-প্রসঙ্গ আর কোনদিন ওঠেনি, মহারাণী নিজে তোলেনি, তিনিও তুলতে সাহস পাননি। তিনি ভাবতেন বাধাটা আপনি একদিন স'রে যাবে, কিন্তু সরেনি। তবু এই সব দিনের স্মৃতিগুলি দুর্লভ সম্পদের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর মনে। মনে আছে বিয়ের কথাটা বলব বলব করেও তিনি বলতে পারেননি। তাঁর সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল বার বার, উপচেও পড়েছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, গদগদ ভাষায়, ছোটখাটো নানা অসম্বৃত অসংলগ্নতায়, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেননি কিছু। মহারাণীর ভাব-ভঙ্গীতেও প্রশ্রয়ের কোন ইশারা ছিল না। তাই

তাঁর বাবা যখন তাঁকে এ বিষয়ে মহারাণীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে বললেন তখন শ্রীহর্ষ বিপন্ন হলেন একটু। কি বলবেন গিয়ে? কি ভাবে পাড়বেন কথাটা?

...নির্জন নদীতীরে গিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার বর্ণ-সমারোহ ম্লান হয়ে এল ক্রমশঃ, শুক্লা পঞ্চমীর শশীকলা স্পষ্টতর হ'ল, টিট্টিভের কল-কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল ওপারের চর। শ্রীহর্ষ উঠে পড়লেন। মন-স্থির করে ফেলেছিলেন তিনি। সোজা চলে গেলেন মহারাণীর কাছে। সোজা কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না।

মহলে নূতন যে নৈশ-প্রহরীটা বহাল হয়েছিল সে শ্রীহর্ষকে চিনত না, সে পথ-রোধ ক'রে দাঁড়াল। বললে, "অন্দরমহলে যেতে মানা আছে। আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে খবর পাঠিয়ে দিতে পারি।" একটা অদৃশ্য হস্ত যেন সজোরে চপেটাঘাত করল শ্রীহর্ষের গণ্ডদেশে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, কিন্তু ফিরে আসতে পারলেন না। আর একটা অদৃশ্য হস্ত প্রবলতর আকর্ষণে টানছিল তাঁকে অন্দরমহলের দিকে। প্রহরীকে বললেন, "ভিতরে খবর পাঠাও, শ্রীহর্ষ এসেছে।" খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী এসে নিয়ে গেল তাঁকে ভিতরে। অন্দরমহলের এলাকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘটনা ঘটল—সিংহটার গর্জন শোনা গেল। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল কে যেন বজ্রকণ্ঠে ব'লে উঠল—খবরদার। দাসী তাকে মহারাণীর মহলে নিয়ে গিয়ে নীচের একটা ঘরে বসিয়ে বলল, "আপনি এখানে বসুন, রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন। আমি খবর দিচ্ছি।"

একটু পরেই মহারাণী এল।

"বিনা নিমন্ত্রণেই যে আজ ব্রাহ্মণ এসে হাজির। ব্যাপার কি?"

"একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

"ছাতে চল তাহলে। এখানে বড় গরম।"

মহারাণীর দ্বিতলের ছাদটি মনোরম। এখান থেকে নব-প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরটি, এমন কি, শ্বেত পাথরের শিব-লিঙ্গটি পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড বাগান, নানারকম গামলায় নানারকম ফুলের গাছ। এ বাগানের মালিনী রঞ্জাবতীও এ বাগানের শোভা। ছিপছিপে দোহারা গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, পিঠে দোদুল্যমান ভুজঙ্গ-নিন্দিত বেণী, বেণীতে জড়ানো বেলফুলের মালা। বঙ্কিম গ্রীবা, বঙ্কিম চাহনি, চাহনিতে মাদকতা মাখানো। একে কেন্দ্র ক'রেও নানা গুজব মহারাণীর অন্দরমহলে। মোনার মা বলেন, রঞ্জাবতী রোজ রাতে দারোয়ানের সঙ্গে ষড় ক'রে বাইরে যায়, ওর নাগর না কি পালকি পাঠায় ওর জন্যে, পালকিটি রোজ রাত্রে নাকি অপেক্ষা করে গ্রামের বাইরে দত্তদের আমবাগানের অন্ধকারে। সিন্ধুবালার দলের লোকরা আবার অন্য কথা বলে। সব গুজব ভিত্তিহীনও নয়। অনেকের মতে আবার রঞ্জাবতী নাকি মহারাণীর দূতী, মহারাণীর খবর নিয়ে যায় মহেন্দ্রনাথের কাছে।

···রঞ্জাবতী ছাদে গোলাপ জল ছিটোচ্ছিল।

মহারাণীর আদেশে দুটি বসবার আসন এনে দিয়ে আবার গোলাপজল ছিটোতে লাগল। চন্দনকাঠের হালকা আসন দুটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ওর উপর বসতে সঙ্কোচ হ'তে লাগল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।"

বসতে হ'ল।

"কিছু খাবে?"

"না।"

রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে শ্রীহর্ষ তারপর ইতস্তত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "যা বলতে এসেছি তা একা তোমাকেই বলতে চাই। ওকে যেতে বল—"

"রঞ্জা তুই নীচে যা—"

যাওয়ার আগে রঞ্জাবতী শ্রীহর্ষের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেল একটা। কিন্তু নীচে গেল না। সিঁড়িতে কান পেতে রইল।

"কি গোপনীয় কথা তোমার ?"

"বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন।"

"তা তো করবেনই, অমন ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, আর বিয়ে না দিলে চলে ? এই তোমার গোপনীয় কথা !"

মহারাণীর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শ্রীহর্ষ এটা প্রত্যাশা করেননি, তিনি ভেবেছিলেন খবরটা শুনে মহারাণীর মুখ ম্লান হয়ে যাবে। হাসি দেখে বিব্রতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"মেয়েটি কেমন ?"

"জানি না। নন্দীগ্রামের বিধুভূষণ ন্যায়রত্নের মেয়ে।"

"কোন্‌টি। তাঁর তো অনেকগুলি মেয়ে।"

"মেজ মেয়ে।"

"সর্বমঙ্গলা ? চমৎকার মেয়ে। তাকে আমি দেখেছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার।"

"তুমি কোথায় দেখলে ?"

"বাবার শ্রাদ্ধের সময় ন্যায়রত্নমশায়ের বাড়ির সবাই এসেছিলেন যে। অনেক মেয়ে এসেছিল তো, তার মধ্যে ওই মেয়েটিই সবার চোখে পড়েছিল। ও যদি তোমার জায়া হয়, তাহলে তুমিও ভবিষ্যতে মেঘদূতের মতো কাব্য লিখে ফেলতে পারবে একটা—"

শ্রীহর্ষ নীরব হয়ে রইলেন।

"অমন মুখ গোমড়া ক'রে আছ কেন ?"

"বাবাকে বলেছি এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

"সে কি ! অনিচ্ছের কারণ ?"

মুচকি হেসে শ্রীহর্ষ বললেন, "একজনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।"

"কে সে সৌভাগ্যবতী ?"

"তা কি তুমি জানো না ?"

"যার কথা আমি জানি সে তোমাকে বিয়ে করবে না।"

শ্রীহর্ষের মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মহারাণীর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুকাল, তারপর বললেন, "লুকোচুরি থাক, আমাকে তুমি চাও না ?"

মহারাণীর চোখের দৃষ্টিতে মাণিক্যদ্যুতি ঝলমল ক'রে উঠল যেন।

"তোমাকে পেলে আমি বর্তে যাব। কিন্তু আমি জানি তোমাকে আমি পাব না। তুমি আমার নাগালের বাইরে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

তোমার আর আমার মাঝখানে অনেক দুস্তর বাধা। তোমার আত্মসম্মান, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার বংশমর্যাদা, তোমার বাবা, তোমার মা এসব ডিঙিয়ে তুমিও আমার কাছে আসতে পারবে না, আমিও তোমার কাছে যেতে পারব না।"

"এর কোনটাই তো বাধা বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

"কিন্তু আমি জানি ওগুলো বাধা। আমি তোমাকে পুরোপুরি পেতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাসনি শ্রীহর্ষ। ভালবাসলে আমার কথার মানে বুঝতে অসুবিধা হ'ত না তোমার। হীরুর মুখে প্রথম যখন বিয়ের প্রস্তাব শুনেছিলে তখনই সেই মুহূর্তে হাটের মাঝখানে আত্মহারা হয়ে পড়নি তুমি। ঘরজামাই হ'লে লোকে কি বলবে এ কথাই সব চেয়ে আগে মনে হয়েছিল তোমার। যদি ভালবাসতে তোমার মনে হ'ত আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু তা তোমার হয়নি।"

"কিন্তু সেইদিনই তো তোমার কাছে এসেছিলাম আমি।"

"এসেছিলে, কিন্তু তোমার হাব-ভাবে সেই সুরটি ঠিক বাজেনি। বরং মনে হয়েছিল বিপদে প'ড়ে আমার কাছে তুমি এসেছ, যদি আমি তোমাকে ঘরজামাই হওয়ার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। আমি তোমাকে উদ্ধার করেওছিলাম। ঘরজামাই হওয়ার কলঙ্ক তোমার মহিমাকে স্পর্শ করেনি।"

"কিন্তু আমি তো তোমার বাবার অনুরোধে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম।"

"ঘাড়ে দশটা মাথা না থাকলে সমুদ্রবিলাসের অনুরোধ উপেক্ষা করা যেত না। তোমার মাত্র একটি মাথা ছিল। তুমি রাজি হয়েছিলে ভয়ে কিম্বা চক্ষুলজ্জায়। দেখ, শ্রীহর্ষ আমাকে তুমি যত বোকা মনে কর, তত বোকা আমি নই। আমাকে হয়তো একটু আধটু ভালবাস তুমি। কিন্তু এতটা বাস না যে আমার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন করতে পার।"

"সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে কেন?"

"হবে। আমার ভালবাসা সর্বগ্রাসী। আমার যে স্বামী হবে আমার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমিও যার স্ত্রী হব, আমি চাইব সে-ও আমাকে গ্রাস করুক। তার মধ্যে আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলব।"

মহারাণীর মুখে-চোখে প্রলুব্ধ ভাব ফুটে উঠল একটা। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'ল, অধর কাঁপতে লাগল। নির্নিমেষে শ্রীহর্ষের দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হ'ল কোনও শ্বাপদ যেন লোলুপ দৃষ্টিতে শিকারের দিকে চেয়ে আছে।

"তোমার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"পারছ না, কারণ আমি যেমনভাবে তোমাকে ভালবেসেছি তুমি আমাকে সেরকম ভাবে বাসনি। সে যে কি জিনিস তা কল্পনা করাও শক্ত তোমার পক্ষে।"

এইবার শ্রীহর্ষ যেন ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পেলেন।

"সত্যি আমাকে ভালবেসেছ? তাহলে আমাকে নাও। আমি নিজেকে দেবার জন্যেই তো এসেছি তোমার কাছে। এতদিন বিরহের চিত্রকূটে ছিলাম—"

"ওটা টোলে-পড়া কাব্যতীর্থের কথা হ'ল। তোমার চোখ-মুখ সে কথা বলছে না। তাছাড়া আমার দিক থেকে আর একটা কথাও

বলবার আছে। তোমার আত্ম-অভিমানকে, তোমার চরিত্রকে, তোমার বাবা মাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার মতো ছেলেকে নষ্ট করতে আমার বিবেকে বাধছে।”

“তোমাকে বিয়ে করলে আমি নষ্ট হয়ে যাব!”

“একেবারে। তোমার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। আমার হাতের পুতুল হয়ে যেতে হবে।”

“ধর, তাতেই যদি আমি রাজি হই।”

মহারাণীর দৃষ্টি থেকে হাসি পিছলে পড়তে লাগল।

“হিমালয় যদি আমার মুঠোর মধ্যে ধরা দিতে রাজি হয় আমি কি তা বিশ্বাস করব, না তাকে মুঠোয় ধরতে পারব? না, শ্রীহর্ষ, তা হয় না। তোমাকে পেলে আমি বর্তে যেতাম কিন্তু তোমাকে আমি পাব না। তুমি অনেক বড়, অনেক উঁচু—”

এই বলে মহারাণী অদ্ভুত কাণ্ড করলে একটা। হঠাৎ প্রণাম করল শ্রীহর্ষকে। প্রণাম করেই চলে গেল। শ্রীহর্ষ খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলেন, কিন্তু মহারাণী আর এল না। মহারাণী নিজের ঘরে খিল বন্ধ ক'রে কাঁদছিল। সে কান্না কেউ দেখেনি।

এর কিছুদিন পরেই সর্বমঙ্গলার সঙ্গে শ্রীহর্ষের বিয়ে হয়ে গেল। মহারাণীর জেদে এবং খরচে বিয়েতে জাঁকজমক হয়েছিল খুব। রোশন-চৌকি, গোরার বাজনা, আলো আর বাজির প্রাচুর্যে সচকিত হয়ে উঠেছিল ও অঞ্চল। যারা জানত না তারা ভেবেছিল মহারাণীরই বিয়ে হচ্ছে বুঝি। ভবভূতি ভট্টাচার্য মহারাণীকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। বাল্যবন্ধুর মেয়ে, খুব জেদি। তাছাড়া এটাও তিনি অনুভব করেছিলেন যে শ্রীহর্ষকে মহারাণীই ফিরিয়ে দিয়েছে। সে যদি ইচ্ছে করত শ্রীহর্ষকে বেঁধে রাখতে পারত তার প্রাসাদে। মহারাণী সর্বমঙ্গলাকে বহুমূল্য কাপড় অলঙ্কারের সঙ্গে নিজের একটি ছবিও উপহার দিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে গালুটির বড় তরফের মালিক তার বাবার নামে একটি

টোল স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলেন এবং শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে নির্বাচন করলেন সে টোলের অধ্যাপক রূপে। শ্রীহর্ষ এ ভার নিতে যখন সম্মত হলেন তখন তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমিও দান করলেন তিনি।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্পর্কটাও বিচিত্র রকম জটিল অথচ মধুর হয়ে উঠেছিল। যা হ'তে পারত, সবাই যা ধ'রে নিয়েছিল হয়ে গেছে, তা কিন্তু হয়নি। শিবলিঙ্গটি ফাঁপা ছিল না, রঞ্জাবতীর অনুমান এবং রঞ্জাবতী-কর্তৃক প্রচারিত গুজবেরও ভিত্তি ছিল না কোনও। মহেন্দ্রনাথকে বিয়ে করবে ব'লে শ্রীহর্ষকে প্রত্যাখ্যান করেনি মহারাণী। সেদিক দিয়ে মহেন্দ্রনাথকে মহারাণী কোনও প্রশ্রয়ই দেয়নি। কিন্তু এই প্রশ্রয় না দেওয়ার কোন প্রমাণ বাইরের লোক পায়নি। বাইরের লোকের চোখে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করবার কোন আগ্রহও ছিল না মহারাণীর। বরং মনে হ'ত বাইরের লোকের এই ভুল-ভাবাটাকে সে যেন উপভোগই করছে হারুণ-অল-রশিদী কায়দায়। সে সত্যি যা নয় সবাই যে তাকে তাই ভাবছে এতে অদ্ভুত ধরণের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করত সে। এই ভেবে সে আনন্দ পেত যে একা একা সে এমন একটা জগতে আছে যেখানে কল্পনার সাহায্যেও প্রবেশ করতে পারছে না কেউ। তার নাগাল পেতে গিয়ে বারবার ভুল রাস্তায় গিয়ে মিথ্যা গুজবের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোকার মতো।

মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, প্রকাশ্যভাবেই আসতেন, কখনও অশ্বারোহণে কখনও হস্তী-পৃষ্ঠে। মহারাণীর খাস গোল-বৈঠকে বসতেন তিনি। একাই বসতেন। কাছে বা দূরে শৌরসেনী-রঞ্জাবতীরা থাকত না। মহারাণীর সঙ্গে আলাপও হ'ত, কিন্তু মহারাণী কখনও মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরয়নি। বৃহৎ বৃত্তাকার বসবার ঘরটিতে কুড়িটি দরজা ছিল, আর প্রত্যেক দরজার সামনে

ছিল বড় বড় ভারী পরদা। ঠিক বাইরে বৃত্তাকার দালানও ছিল একটি। সেখানেও বসবার জায়গা ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন ঘরে বসতেন মহারাণী তখন থাকত দালানে। তু'জনের কথাবার্তার মাঝখানে তুলত কুড়িটা পরদা। মহারাণী কখন যে কোন পরদার অন্তরালে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তা অনেক সময় বুঝতে পারতেন না মহেন্দ্রনাথ। অনেক সময় ধাঁধা লাগত। কখনও মনে হ'ত মহারাণী তাঁর পিছনে রয়েছে, কখনও মনে হ'ত সামনে, কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে। হয়তো মহারাণী ইচ্ছে করেই এই ধাঁধা সৃষ্টি ক'রে মজা দেখত, কিম্বা হয়তো মহেন্দ্রনাথেরই মনের ভুল এটা। আলাপের এই অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার আগে তু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল অবশ্য। তার মানে, এর আর একটা প্রাক্ পর্বও ছিল।

মহেন্দ্রনাথ যখন নিজের বিষয়ের মালিক হয়ে বসলেন তখন দিন-কতক মশগুল হয়ে রইলেন বেদানাকে নিয়ে। বিদেশ থেকে কারিকর শিল্পীরা এসে নির্মাণ করতে লাগল বেদানা-মহল। তাঁর ময়ূরপঙ্খীগুলি নানা সাজে সেজে ভেসে বেড়াতে লাগল বধূসরা নদীর জ্যোৎস্নাকুল স্বচ্ছ ধারায় তরঙ্গ-শিহরণ তুলে তুলে। বেদানার কিংখাবে-ঢাকা পালকি মাঝে মাঝে ঢুকত এসে মহারাণীর অন্দর-মহলে। গোল বৈঠকে গানের আসর বসত। দীনা বাইজি তখনও বেঁচে ছিল। সে যা পেন্‌সন্ পেত তাতে অন্যত্র গিয়েও সে সুখে বাস করতে পারত। কিন্তু মালিকের দরবার ছেড়ে সে যেতে চায়নি। নিজের মহলে একবেলা স্বপাক নিরামিষ আহার ক'রে হিন্দু বিধবার মতো জীবন যাপন করতে সে। সঙ্গীত-চর্চাও ছাড়েনি। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায়, কখনও বা দ্বিপ্রহরে তার সুর-লহরী ভেসে বেড়াত আকাশে বাতাসে, মনে হ'ত দীনা বাইজি অতীতের দিনগুলি স্মরণ ক'রে যেন কাঁদছে। সমুদ্রবিলাসের স্মৃতি-মন্দিরে দীনা

বাইজিই রোজ সুরের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখত। বেদানার পালকি এলে দীনা বাইজির ডাক পড়ত গোল-বৈঠকে। গানের আসর জমে উঠত সেখানে। সুর উপচে পড়ত যেন চারিদিকে। ময়ূরেরাও বাগানে পেখম তুলে নাচত, চঞ্চল হয়ে উঠত বুলবুলির দল, গিট্‌কিরি দিয়ে দিয়ে সঙ্গত করত তারা, পাহাড়ি ময়নার কণ্ঠে সুর ফুটত। বেদানা নাচত, তবলায় সঙ্গত করত মোহিনী, সেতার বাজাত রঞ্জাবতী, দীনা বাইজি একধারে বসে স্তিমিতলোচনে তানপুরায় ঝঙ্কার দিতে দিতে স্বপ্ন দেখত সেই সব দিনের যা আর ফিরবে না।

…এই ভাবেই চলছিল, এমন সময় নূতন ধরণের ঘটনা ঘটল একটা। মহারাণীর ভালো জাতের নানা রকম পায়রা ছিল। শখ মিটে গিয়েছিল ব'লে কিছুদিন আগে সেগুলো দিয়ে দিয়েছিল সে এক পাখী-ওলাকে। তারই একটা পায়রা একদিন উড়ে এসে বসল মহারাণীর অলিন্দের আলিসায়। দুধের মতো ধপধপে শাদা রং, টুকটুকে লাল চোখ দুটি চুনীর মতো। মনে হ'ল পুরনো মনিব মহারাণীকে চিনেছে সে, ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এল একটু। মহারাণী হাত বাড়াতেই সে একেবারে উড়ে এসে কাঁধে বসল। তারপরই মহারাণী দেখতে পেল আসল জিনিসটি। পায়রাটির পায়ের গোছে রঙীন কাগজ বাঁধা রয়েছে একটি। মহারাণী চেয়ে দেখল চারদিকে, চেয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। কেউ ছিল না। পায়রাটাকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। তারপর তার পা থেকে খুলে নিল কাগজটা। দেখল শুধু রঙীন নয়, সুগন্ধীও, আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। মহেন্দ্রনাথের চিঠি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কিছুতেই ভুলতে পারছি না। গেলে দেখা হবে কি? এক পাখী-ওলা এসেছিল বাড়ীতে, তার কাছে শুনলাম এ পায়রাটি আপনারই ছিল একদিন। তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে আপনার কাছেই ফেরত

পাঠালাম আবার। আশা আছে এ পুরাতন মনিবের কাছে ফিরে যাবে। উত্তর যদি দেন, লোক মারফত পাঠাবেন। উত্তরের আশায় রইলাম।"

উত্তর গিয়েছিল হাতীর পিঠে মাদ্রাজিনী মাহুতের হাতে।

মহারাণী লিখেছিল, "এলে খুব আনন্দিত হব। আমাদের ম্যানেজারকে খবর দিয়ে আসবেন। এলে কথাবার্তা হবে।"

দিন সাতেক পরে যথারীতি খবর পাঠিয়ে আইন কানুন বাঁচিয়ে মহেন্দ্রনাথ এলেন একদিন। শৌরসেনী এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল তাঁকে অন্দরমহলের গোলবৈঠকে। সেকালের নিয়ম অনুসারে পানের বাটা, আতর দান, গোলাপ পাশ সামনে সাজিয়ে দিয়ে শৌরসেনী মৃদু কণ্ঠে ব'লে গেল—"মা পরদার ওপারে এসেছেন। আপনি আলাপ করুন।"

মহারাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কার। বেদানার মুখে আপনার প্রায়ই খবর পাই। আজ কষ্ট ক'রে এসেছেন, এ আমার পরম ভাগ্য।"

"আমার কাছেও বেদানা আপনার কথা রোজ বলে। আমাদের দুজনের মধ্যে বেদানাই তো সেতু। কিন্তু সে সেতুর উপর দিয়ে অশরীরী-আমরা যাতায়াত করেছি এতদিন ধরে। আজ আশা ক'রে এসেছিলাম সশরীরে সাক্ষাৎ হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মহারাণী।

তারপর বলল, "সম্ভব হ'লে হ'ত, কিন্তু তা যে সম্ভব নয় তা আপনিও জানেন।"

"নয় কেন? পরদাটা সরিয়ে দিলেই তো হয়।"

"যেদিন সম্ভব হবে সেদিন পরদা আপনি সরে যাবে।"

"বাধাটা কি?"

"কিন্তু সেতুই বাধা।

"কিন্তু বেদানাকে আমি জিগ্যেস করেছি, তার আপত্তি নেই।"

"সেকথা আমাকেও সে বলেছে। কিন্তু আমি তার মনের কথা জানি।"

নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আপনার দাসীরা আশেপাশে আছে না কি কেউ। এসব আলোচনা বাইরে জানাজানি হবে না তো ?"

"না, দাসীরা কেউ নেই আশেপাশে। সবাইকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু খসখস কি একটা আওয়াজ পাচ্ছি যেন ?"

"আমার পোষা সিংহটা বসে আছে আমার পাশে।"

"সিংহ ? কি সর্বনাশ, কিছু বলবে না তো। ছাড়া আছে, না বাঁধা আছে—"

"ছাড়াই আছে। ও বুঝতে পারে কে শত্রু কে বন্ধু। আপনাকে কিছু বলবে না।"

মহেন্দ্র আবার বসে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল পরদাটা সরিয়ে দিতে।

"সিংহকে পাশে নিয়ে বসে আছেন! অদ্ভুত আপনার শখ তো। আপনার সাহসকেও বলিহারি যাই।"

"মহারাজ জবাব দাও।"

মৃদু গর্জন শোনা গেল পরদার ওপারে। মনে হ'ল সিংহ যেন গম্ভীর কণ্ঠে হাসল একটু। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন পরদাটার দিকে।

মহারাণী সহসা অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হ'ল।

"ওসব কথা থাক। অন্য আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি আমি। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, সামনা-সামনিই বলি যদি অনুমতি দেন। ভাবছিলাম চিঠি লিখব।"

"কি বলুন। আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই। সাধ্যাতীত না হ'লে নিশ্চয়ই আপনার আদেশ আমি পালন করব।"

"আমার বিষয়ের ভারটা তাহলে আপনি নিন। ও গুরুভার বহন করবার শক্তি আমার নেই।"

"ওটা আপনি বিনয় ক'রে বলছেন। যিনি সিংহকে স্বচ্ছন্দে পাশে বসিয়ে রাখতে পারেন তাঁর শক্তিতে সন্দেহ করি কি ক'রে।"

"ওই সিংহের জন্যই আমার সমস্ত শক্তি আর সময় খরচ হয়ে যায়। বিষয়ের খোঁজ খবর নেবার মতো উদ্বৃত্ত আর কিছু থাকে না। কিশোরীকাকা মাঝে মাঝে এসে কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে যান, আমি না দেখেই সই করে দি—"

"দেখলেই পারেন।"

"একবার দেখেছিলাম, বুঝতে পারিনি।"

মহেন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন।

"বিষয়ের ভার আমি নিতে পারি। কিন্তু আইনত সে অধিকার দিতে হবে আমাকে।"

"দেব।"

"বিশেষ ক'রে আমাকে এ ভার নিতে বলছেন কেন? আমার চেয়ে বিচক্ষণ লোক ঢের আছেন। আপনাদের ম্যানেজার কিশোরীবাবুও বেশ পাকা লোক।"

"আপনি জানেন না বোধ হয়, আমার দুই সৎ মা এখনও জীবিতা আছেন। তাঁদের দলও আছে। খবর পেয়েছি কিশোরীকাকা একটা দলে যোগ দিয়েছেন।"

"এ জানবার পরও আপনি না দেখে কাগজে সই করেছেন?"

"না, জানবার পর আর করিনি। কিন্তু কি করব তা-ও ঠিক করতে পারছিলাম না, এমন সময় আপনার কথা মনে হ'ল।"

"তা মনে হ'ল কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল মহারাণী। মহেন্দ্রনাথের মনে হ'ল হাসির মৃদু গিটকিরি যেন শোনা গেল একটা।

"আপনার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আপনিই তো সব দেখা-শোনা করতেন। তাই বোধ হয় মনে হয়েছে কথাটা।"

"পরের কাজটা আগেই করিয়ে নিতে চান বুঝি। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এতকাল ধরে যে আশা আমি ক'রে আছি তার সম্ভাবনা কি লুপ্ত হয়ে গেল একেবারে?"

"ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে। তবে আমি জানি আপনি মহৎ লোক, স্বার্থ-সিদ্ধির আশা না থাকলেও আপনি আমার এ উপকারটি করবেন।"

"নিশ্চয় করব, আর স্বার্থের খাতিরেই করব। আর কিছু না হোক এই উপলক্ষে আপনার দরবারে বারবার এসে আমার আর্জি পেশ করবার সুযোগ তো পাব। আচ্ছা, সামনাসামনি কি কোনদিনই দেখা হবে না?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "না—"

"লোকনিন্দাকে ভয় করেন?"

এই ছোট প্রশ্নের উত্তরে মহারাণী যে এমনভাবে এত কথা বলবে তা মহেন্দ্রনাথ আশা করেননি। মহারাণীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটু আবেগও লক্ষ্য করলেন তিনি।

মহারাণী বলল, "না। ভয় নিজেকে। বেদানাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি নিজের অসংযমের জন্য যদি তা ভাঙতে হয় তাহলে সেটা মর্মান্তিক হবে আমার পক্ষে। এত মর্মান্তিক হবে যে তারপর আমি আর বাঁচব না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যিই আমার কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়। তাই আমি সাবধানে থাকতে চাই।"

কথাগুলো বানানো মেকি কথা মনে হ'ল না মহেন্দ্রনাথের। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন এই আত্মগোপনের আসল

হেতুটা কি? তাঁর রক্ষিতা বেদানার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটাই কি সত্যি এত বড় হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, "বেদানাকে আমিও ভালবাসি। তাকে ত্যাগ করবার বাসনাও আমার নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক একটা রক্ষিতাকে নিয়ে জীবন কাটানো যাবে না, বিয়ে আমাকে করতেই হবে। বেদানাই আমাকে রোজ অনুরোধ করছে বিয়ে করতে।"

"করুন তাহলে। আপনার পাত্রীর অভাব হবে না।"

"ছোট তরফ, মানে আমার কাকা রোজই একটি ক'রে সম্বন্ধ আনছেন। আর আমি রোজই তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

"বিয়ে যখন করবেনই ঠিক করেছেন তখন ওদের ভিতর থেকে একজনকে বেছে নিচ্ছেন না কেন?"

"এর উত্তর তো আপনার অজানা নেই।"

"তা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্যটা আমি আশা করি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।"

"বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আপনি 'হাঁ' বলছেন কি 'না' বলছেন তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আর যতটুকু পেরেছি তা-ও আমি স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত নই। আমার কি মনে হচ্ছে বলব?"

"বলুন—"

"আমার মনে হচ্ছে ওটা আপনার নারী-সুলভ ছলনা, আমার আগ্রহের গভীরতা হয়তো মাপছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই, আমার বিশ্বাস আছে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব। আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

"আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু তবু আপনাকে একটা কথা বলছি। আমার সম্বন্ধে আপনার বর্তমান মনোভাব বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকুক এটা কি আপনি চান না?"

"চাই বইকি। নিশ্চয় চাই।"

"তাহলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন। আমাদের দু'জনের মাঝখানে এই পরদার আড়ালটুকু যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই তো তা অটুট থাকবে। দিন দিন আরও মধুর, আরও রঙীন হবে হয়তো। সেইটেই কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়? বিয়ে ক'রে সব চুকিয়ে দেওয়া কি ভালো?"

"আপনি যা বললেন তা খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কাব্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা একটু স্থূল রসের চর্চা না করলে তৃপ্তি পাই কি?"

"সে তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে অনেক উপকরণ জুটবে আপনার। জুটেওছে হয়তো। আমার রুচি একটু অন্যরকম। আমি ওই শস্তা উপকরণের দলে গিয়ে ভীড় বাড়াতে চাই না। আপনার মনের কোণে একটু ঠাঁই যদি থাকে তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।"

"চিরকালই তাহলে ওই পরদা দুলতে থাকবে।"

"তেমন ঝড় যদি আসে, পরদা কেন, আমি সুদ্ধ উড়ে যাব। কিন্তু সে অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর ক'রে তো কোন হিসাব করা চলে না। আপাতত আমার উপর আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি থাকলেই যথেষ্ট মনে করব আমি।"

মহেন্দ্রনাথের ভ্রূযুগল কপালের উপর উঠে গেল।

"ঝড়টা কি রকম ঝড় হবে? আধ্যাত্মিক?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মানসিক নিশ্চয়ই।"

"আমার মনে ঝড় তো অনেকদিন থেকেই উঠেছে।"

"আমার মনে ওঠেনি।"

"আপনার মনে ঝড় তোলবার জন্যে কি করতে হবে?"

একটু থেমে মহারাণী বললে, "এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমার পক্ষে যেটা বেশী দরকারী সেই কথাই বলুন। আমার বিষয়ের ভার নেবেন তো?"

"নেব। কাল আমার ম্যানেজার একটা কাগজ নিয়ে আসবে তাতে

সই ক'রে দেবেন। সেটা আদালতে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল একটা। নানাসাহেবের নাম শুনেছেন ?"

"শুনেছি বইকি। ইংরেজরা তো তাঁকে ধরতে পারেনি, শুনেছি তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

"ঠিক শুনেছেন। আমাদের কালেক্‌টার সাহেব তাঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে একটা নোটিস পাঠিয়েছেন। লিখেছেন কেউ যদি নানাসাহেবকে ধরিয়ে দিতে পারে গভর্নমেণ্ট তাঁকে পুরস্কৃত করবেন, রাজ সরকারে আরও নানারকম সুবিধা ক'রে দেবেন। আপনার দফতরেও হয়তো নোটিসটা এসেছে। নি-খরচায় সরকারের সুনজরে পড়বার মস্ত সুযোগ এটা। আর সরকারের সুনজরে থাকলে বিষয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকবে না।"

কথাটা শুনে মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইল মহারাণী। তারপর বলল, "একটা গোপন কথা কি নির্ভয়ে আপনাকে বলতে পারি ?"

"নিশ্চয় বলতে পারেন।"

"নানাসাহেব যদি আমার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন আমি ককৃখনো তাঁকে ধরিয়ে দেব না। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ যেদিন এখানে পৌঁছল সে দিন আমি সারারাত্রি ঘুমতে পারিনি।"

"আপনার বাবা কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করতেন না।"

"তা জানি। অনেক বিষয়েই বাবার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না। এ বিষয়েও ছিল না, যদিও মুখ ফুটে তাঁকে সে কথা বলবার সাহস হয়নি। অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন তো। আপনি যদি নানাসাহেবকে মুঠোর মধ্যে পান ধরিয়ে দেবেন নাকি ?"

"একথা শোনাবার পর আমিও নির্ভয়ে বলতে পারি ককৃখনো দেব না। কিন্তু দেখবেন বাইরে যেন কিছুতেই না প্রকাশ পায় একথা। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতির সামান্য প্রমাণ পেলেও গর্ভনমেণ্ট নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে। দুজন জমিদারের ফাঁসি হয়েছে। অনেকের বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে।"

"আমার বিষয়ের ভার তো আপনিই নিলেন। রাখতে পারেন থাকবে না রাখতে পারে থাকবে না।"

"এ কথাটা কিন্তু গোপন থাকে যেন।"

"থাকবে।"

"বেশ, আজ তাহলে উঠলুম। উঠতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু দরবার আছে। আজ অনেক গুলি প্রজা আসবে। আবার কবে আসব?"

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে নিয়ে মহারাণীও খিড়কির বাগানে চ'লে গেল, আর এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে কষ্টিরও তাক লেগে গেল সে সব দেখে। মহারাণী মহারাজের মহলে গিয়ে প্রথমে তাকে খুব আদর করল খানিকক্ষণ। মহারাজ প্রথমটা খুশী হয়েছিল, কিন্তু বেশী ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করত না সে। মহারাণী তার পিঠে ব'সে গলা জড়িয়ে যখন বারবার আদর করতে লাগল তখন আপত্তি করল সে—ঘাড় ফিরিয়ে ঘাঁউ করে উঠল। এতে মহারাণী ক্ষেপে গেল যেন। সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, নাসার অগ্রভাগে কম্পন জাগল।

"কি, এতবড় আস্পর্ধা, আপত্তি জানানো হচ্ছে। মজা দেখাচ্ছি—"

চাবুকটা বার ক'রে সপাসপ বসিয়ে দিলে ঘা কতক তার পিঠে। অমন প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজ, কিন্তু এই চাবুকটাকে তার বড় ভয়। চাবুক খেয়ে একেবারে কাচুমাচু হয়ে পড়ল,—যেন সিংহ নয়, কুকুর।

"আমার পায়ের উপর মাথা রাখ্—"

এ আদেশ কিন্তু পালন করল না মহারাজ।

"রাখ্, রাখ্ বলছি—"

আবার পড়ল কয়েক ঘা। মহারাজের কেশর ফুলে উঠল, ল্যাজ আছড়াতে লাগল সে মাটির উপর, কিন্তু পায়ের উপর মাথা সে রাখলে না।

"শ্রীহর্ষের মতন আত্মসম্মানী হয়েছেন! রাখ আমার পায়ে মাথা। রাখতেই হবে তোকে—"

জোর ক'রে তার মাথাটা টেনে পায়ের উপর গুঁজড়ে ধ'রে রইল মহারাণী। মহারাজ কোন আপত্তি করল না এতে। কিন্তু মহারাণী যেই মাথাটা ছেড়ে দিলে অমনি মাথা তুলে ঘাঁউ ঘাঁউ ক'রে গর্জন করলে দুবার।

যেন বলল, "কি করছ তুমি এসব,—ভাল লাগছে না।"

"হাত-জোড় ক'রে থাক।"

মহারাণী তার সামনের থাবা দুটো জোড় ক'রে ধ'রে রইল। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মাত্রই মহারাজের যুক্ত থাবা বিযুক্ত হয়ে গেল আবার।

"যা তোর কাছে থাকব না আমি, ওর কাছে যাচ্ছি।"

মহারাণী ছুটে চলে গেল বাঘের মহলে। বাঘটা আগে থেকেই গজরাচ্ছিল, ময়ূরটাও নাচছিল পেখম মেলে তীক্ষ্ণ কেকারব তুলে। বাঘের মহলে যেতেই এক লাফে এগিয়ে এল বাঘটা। তারপর যেমন তার অভ্যাস সামনের থাবা দুটো তুলে দিল মহারাণীর কাঁধে। মহারাণী দু'হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরল তার। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হ'ল, একটা নয়, অনেকগুলো।

মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে গর্জন করছে।

মহারাণী কিন্তু এমন ভাব করলে যেন শুনতে পায়নি, ভ্রূক্ষেপও করলে না। বাঘকে খানিকক্ষণ আদর ক'রে গেল সে ময়ূরের ঘরে। ময়ূরের সঙ্গে নাচল খানিকক্ষণ। আবার গর্জন করল মহারাজ, শেষকালে লাফিয়ে পড়ল লোহার গরাদের উপর, মনে হ'ল এখুনি বুঝি সব ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসবে। মহারাণীর তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ওদের ঘরে কাটিয়ে তারপর মহারাণী আবার এসে ঢুকল মহারাজের মহলে। মহারাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সম্ভবত, একধারে বসেছিল সামনের থাবা দুটোর উপর মুখ রেখে। মহারাণী যখন ঢুকল, তখন আড়চোখে সে চেয়ে দেখল একবার, উঠে এল না, মনে

হ'ল অভিমান ক'রে বসে আছে। মহারাজের মহলে কাঠের একটা বড় গুঁড়ি ছিল। মহারাণী তার উপর উঠে বসল পা ঝুলিয়ে। টুকটুকে আলতা-রাঙা পা ছুটিতে রোদ প'ড়ে ঝকমক ক'রে উঠল রূপোর গুজরি-পঞ্চম।

"আয়, উঠে আয়। ইস্, মান ক'রে বসে আছেন!"

জিব বার ক'রে, নাক কুঁচকে, ঠোঁট উল্টে ভেংচি কাটল মহারাণী।

"আয় উঠে আয়—"

মহারাজ উঠে এল।

"পায়ের উপর মাথা রাখ্, রাখ্ বলছি।"

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা তার নত হ'ল না।

মহারাণী তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যা করল তা অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। কেঁদে ফেলল!

উঠে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল—"তুইও এমন করছিস? তুইও শ্রীহর্ষ হয়ে যাবি?—"

মহারাজের গলা থেকে গর গর ক'রে একটা শব্দ হ'তে লাগল। মনে হ'ল এর উত্তরে সে গদগদ কণ্ঠে কি যেন বলছে। কিন্তু সে শব্দ ডুবে গেল ময়ূরের মুহুর্মুহু কেকায় আর বাঘের গগন-বিদারী গর্জনে। মনে হ'ল মহারাণীর অন্তরের আলোড়নই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠছে ওদের কণ্ঠে। মহারাণী হঠাৎ আবার ছুহাত দিয়ে চেপে ধরল মহারাজের মুণ্ডটা বুকের উপর। পশুমহলের পূর্বদিকে সারি সারি নাগলিঙ্গম গাছ ছিল কয়েকটা। সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কষ্টি দেখছিল সব। সে তাড়াতাড়ি গাছের একটা কচি ডাল ভেঙে তিনবার কামড়ে সেটা মাটিতে ফেলে দিলে তারপর তিনবার থুতু ফেললে তার উপর। তারপর মহারাণীর দিকে চেয়ে তিনবার মাথা নাড়লে ধীরে ধীরে। এটা ওর একটা তুক্, মহারাণীর মঙ্গলের জন্য। সিংহের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ওর ভাল লাগছিল না। কঙ্গো দেশের মেয়ে সে। যে সব সিংহের কেশর কালো তাদের

প্রকৃতি ভাল করেই জানা আছে তার মহারাণীর জন্য তার ভয় হ'ল হঠাৎ।

সেদিন আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যার খবর কেউ রাখেনি। মহারাণী যদিও সেদিন মহেন্দ্রনাথকে বললে যে দাসীদের সে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাঁর কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ হবার আশঙ্কা নেই, কিন্তু মহারাণী জানত না যে রঞ্জাবতী নীচে যায় নি, ছাতে চ'লে গিয়েছিল, তারপর নেবে এসেছিল চুপি-সাড়ে। সব শুনেছিল সে। মহারাণীর কাছে যখনই বাইরের কোন পুরুষ আসত তখনই সজাগ হয়ে উঠত রঞ্জাবতীর সমস্ত কৌতূহল। এর কারণ ছিল। দরিদ্রের মেয়ে রঞ্জাবতী, তার ডাক নাম ছিল কুড়োনী। তাকে এক মেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন কিশোরীমোহন, তিনি কুড়োনী নাম দিয়েছিলেন তার। অপরূপ সুন্দরী ছিল কিন্তু। একদিন তাকে দেখে মহারাণীর পছন্দ হ'ল খুব, কিশোরীকাকার কাছ থেকে চেয়ে নিলে তাকে। রূপের জোরে কুড়োনী আশ্রয় পেলে অন্দরে, তারপর মহারাণীর ছাতবাগানের মালিনী হ'ল সে। রঞ্জাবতী নামকরণ মহারাণীরই। সমবয়সী ছিল ব'লে সখীর মতোই ব্যবহার করত তার সঙ্গে মহারাণী। রঞ্জাবতী যখন যৌবনে উত্তীর্ণ হ'ল তখন তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল অন্দর মহলের সবাই। ক্রমে ক্রমে এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে সে-ও কিছু কম নয়। তেমন সুযোগ যদি এসে পড়ে, মানে, তেমন বড়লোকের নজরে সে যদি প'ড়ে যায় তাহলে রূপের তরী ভাসিয়ে ঐশ্বর্যের সাগরে পাড়ি জমানো অসম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু মহারাণীর আইন অনুসারে বাইরের কোন পুরুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না অন্তঃপুরে। তাই যখনই মহারাণীর আমন্ত্রণে কোনও গণ্যমান্য পুরুষের অভ্যাগম হ'ত, রঞ্জাবতী কোন না কোন উপায়ে আড়াল থেকে লক্ষ্য করত তাদের হাব-ভাব, শুনত তাদের আলোচনা,

নানা ছুতোয় চেষ্টা করত তাদের সামনে যেতে। এতে তির্যকভাবে একটু যেন তৃপ্তি হ'ত তার। সাধারণ মেয়ে হ'লে এসব কথা অন্দরমহলের আর পাঁচজনের কাছে গল্প ক'রে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করত। কিন্তু রঞ্জাবতী সে ধরণের মেয়ে ছিল না। যা শুনত, যা দেখত নিজের মনের পেটিকায় চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিত সব। চিন্তা করত, সুযোগ খুঁজত, কখন কোন্ সংবাদটি তার কাজে লাগবে। একটিমাত্র লোক ছিল যার কাছে মন খুলত সে, ম্যানেজার কিশোরীমোহন। মহারাণীর অনুমতি নিয়ে অন্দরমহলের পালকিটায় চ'ড়ে সে মাঝে মাঝে কিশোরীমোহনের বাড়িতে যেত দেখা করতে। কিশোরীমোহনই রঞ্জাবতীকে এনে দিয়েছিলেন, রঞ্জাবতী কিশোরীমোহনকে দাদু বলত, তাই মহারাণী এতে আপত্তির কিছু দেখেনি। রঞ্জাবতী পালকি ক'রে বেরিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আর এই কারণেই তাকে কেন্দ্র ক'রে নানা গুজব গুঞ্জিত হ'ত অন্দরমহলে।

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার একটু পরেই রঞ্জাবতী মহারাণীর কামরায় এল কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাবার জন্য অনুমতি নিতে। এসে দেখল মহারাণী ঘরে নেই। শৌরসেনী ছিল, সে বলল, "মা সিংহের মহলে আছেন, শব্দ শুনচিস না ?"

ও মহলে কারও যাবার হুকুম নেই, সুতরাং রঞ্জাবতীকে অপেক্ষা করতে হ'ল। কিছুক্ষণ পরে মহারাণী যখন নিজের কামরায় ফিরল তখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল রঞ্জাবতী। চোখ দুটো লাল, বুকের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, খোঁপা এলিয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বইছে।

রঞ্জাবতীকে দেখে মহারাণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

"কিছু বলবি না কি, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

"অনেকদিন দাদুর কাছে যাইনি, যদি বলেন, একটু ঘুরে আসি।"

"যা।"

রঙ্গাবতী চলে গেল।

একটু পরে কিশোরীমোহন দু'টি সাংঘাতিক খবর জানতে পারলেন সেদিন। প্রথম, সমস্ত বিষয়ের ভার মহেন্দ্রনাথ নেবেন। দ্বিতীয়, পলাতক নানা সাহেবের উপর এদের দুজনেরই গভীর সহানুভূতি আছে। প্রথম খবরটি শুনে তিনি হতাশ হলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি তাঁর আহত-আশা-তরুতে জল-সিঞ্চন করল। মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভয় করতেন কিশোরীমোহন। মহেন্দ্রনাথ যদি স্টেটের ভার নেন তাহলে সেখানে যে কোন রকম ডালই গলবে না এ তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন। সমুদ্রবিলাসের তৃতীয়-পক্ষ কুসুমের একটা কাকা খাড়া ক'রে বিষয়টা ভাগাভাগি করবার যে মতলব তিনি ফেঁদেছিলেন তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল সহসা।

কিশোরীমোহনের এ মনোভাবের মূল সন্ধান করতে হ'লে তাঁর অতীত জীবনের পরিচয় নিতে হয়। কিশোরীমোহন সমুদ্রবিলাসের স্টেটের অতি পুরাতন কর্মচারী। এই রোগা কালো খর্বাকৃতি নাক-সর্বস্ব লোকটি সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সমুদ্রবিলাসের অনুগ্রহেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এজন্য তিনি সমুদ্রবিলাসের প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করেননি কখনও। সমুদ্রবিলাসের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। এর কারণ ছিল। সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজার হওয়ার জন্য যে মূল্য তিনি দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরও যদি তিনি হতেন তাহলেও তাঁর মনে হ'ত দাম উশুল হয়নি। বহুকাল আগেকার সে সব কথা এখনও মনে জ্বল জ্বল করছে তাঁর, কখনও ভুলবেন না।...

...সমুদ্রবিলাস তখন যুবক, সবে জমিদারীর মালিক হয়েছেন। কিশোরীমোহনের যে গ্রামে বাস তার পাশেই বিল আছে একটা। সেই বিলে সদ্য-কেনা-বন্দুকটা নিয়ে পাখী শিকার করতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু শিকার ক'রে বসলেন অন্য জিনিস।

হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এল, ঝড় উঠল, তারপর নামল শিলা-বৃষ্টি। সমুদ্রবিলাস ছুটতে ছুটতে এসে সামনেই যে বাড়িটা পেলেন, তাতেই ঢুকে পড়লেন। সেটা যে কিশোরীমোহনের বাড়ি সেটা তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন। কিশোরীমোহনের যুবতী স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না। তার পরদিন কিশোরীমোহনকে নিজের খাশ কামরায় ডেকে সমুদ্রবিলাস বললেন, "দেখ কিশোরী, কাল শিলাবৃষ্টিতে বড় নাকাল হয়েছিলাম। তুমি বোধহয় জান না, তোমার বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলাম শেষটা। সেখানে একটি সুন্দরী বউ দেখলাম। সে কে?"

"আমার বউ!"

"ও। তুমি তাহলে আর একটা বিয়ে কর। ওকে আমারই চাই—"

বজ্রাহতাবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন কিশোরীমোহন। তখন তিনি অতি দরিদ্র। সমুদ্রবিলাসের স্টেটে দু'টাকা মাইনের মুহুরি। ভাঙা পর্ণকুটিরে বাস করেন। সমুদ্রবিলাসের এ দাবীর বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস হ'ল না তাঁর। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমুদ্রবিলাস তার মুখের দিকে একনজর চেয়ে বললেন, "ইচ্ছে করলে জোর ক'রে আমি কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। তুমি যদি রাজি না হও, জবরদস্তি করব না আমি। আর যদি রাজি হও এর বদলে যা চাও তাই দেব। তোমার কুঁড়ে ঘর আর থাকবে না, পাকা বাড়ি করিয়ে দেব। জোত-জমি দেব, স্টেটের চাকরিতে উন্নতি ক'রে ভবিষ্যতে তোমাকে ম্যানেজার পর্যন্ত করব।"

কিশোরী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"আচ্ছা, এখন যাও, ভেবে কাল উত্তর দিও।"

তার পরদিন কিশোরীমোহনের সম্মতি পেয়ে সমুদ্রবিলাস সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কামুকের বাসনা কিন্তু চরিতার্থ হয়নি। সুভাষিনী কোথায় যে ছুটে বেরিয়ে গেল

তা বোঝা গেল না অন্ধকারে। ফিরে আসতে হ'ল সমুদ্রবিলাসকে। দু'দিন পরে চণ্ডীতলার পাতকুয়া থেকে পাওয়া গেল সুভাষিনীর মৃতদেহটা।

সমুদ্রবিলাস তাঁর প্রতিশ্রুতি কিন্তু পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। কিশোরীমোহনকে পাকা বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রচুর জোত-জমি দিয়েছিলেন। পুরাতন নায়েব ধর্মরাজ সেন মারা যাবার পর তাকে নায়েব ক'রে দিয়েছিলেন। পিতা অম্বরবিলাসের আমলের ম্যানেজার শশীকান্ত রায় যখন পেন্সন নিয়ে বারানসী বাস করতে গেলেন তখন কিশোরীমোহনকেই ম্যানেজার পদে বাহাল করলেন সমুদ্রবিলাস। কিশোরীমোহন কিন্তু সমুদ্রবিলাসকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। সারাজীবন তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। সমুদ্রবিলাস যদি বলাৎকার করতেন তাহলে বোধ হয় এত ঘৃণা করতেন না তাঁকে তিনি। কিন্তু তিনি যে মূল্য দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন এইটেই কাঁটার মতো বিঁধে ছিল তাঁর বুকে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি তিনি, ইশারায় ইঙ্গিতেও কিছু করবার সাহস হয়নি তাঁর। তিনি এটা নিঃসংশয়ে জানতেন বিশ্বাসঘাতকতার সামান্যতম আভাস পেলেও আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে গুলি ক'রে বসবেন সমুদ্রবিলাস। তাই মনের মধ্যে ঘৃণার তুষানল জেলে বাইরে ভিজে বেরালের মতো কালযাপন করেছেন তিনি সমুদ্রবিলাসের জীবদ্দশায়। মহারাণীর উপরও তাই বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না তাঁর। ওর নানা রকমের বেয়াড়াপনায় মনে মনে রেগে খুন হয়ে যেতেন কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না, বলবার সাহস হ'ত না, হেসে হেসে সায় দিয়ে যেতে হ'ত। কারণ তিনি জানতেন ছোট হ'লে কি হবে, ও জাত-সাপের বাচ্ছা, সমুদ্রবিলাসেরই মেয়ে, নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও করতে পারে না। এক কথায় তাঁকে তাড়িয়েও দিতে পারে। কিন্তু মনে

মনে প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষুধিত হয়ে ছিলেন তিনি। বস্তুত, সেই সুযোগের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। কুসুমবালার দাবীটার জন্যে একটা জাল উইল করবারও মতলব ছিল তাঁর। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলেই তো সব আশা নির্মূল হ'ল। তাঁর চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত হবে, খুব বুদ্ধিমান চৌকষ ছেলে।

কিশোরীমোহন আর বিয়ে করেননি। সাহস হয়নি। ভেবেছিলেন ওই কুড়োনো মেয়েটাকেই মানুষ করবেন, নাতনী সম্পর্ক পাতালেন তার সঙ্গে। কিন্তু তাতেও বাদ সাধল ওই মহারাণী, ওর রূপ দেখে চেয়ে বসল ওকে। তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তবে এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। রঞ্জাবতী শুধু মহারাণীর বাগানের মালিনীই নয়, মহারাণীর অন্দরমহলে সে কিশোরীমোহনের চরও। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অন্দরমহলের সব খবর সে তাঁকে দিয়ে যেত।

খবর তুটি শুনে কিশোরীমোহন নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বাঁ হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে নাকের বড় বড় চুলগুলি টানতে লাগলেন। এটি তাঁর মুদ্রা-দোষ। তিনি বুঝলেন কুসুমকুমারীর দাবী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলে ওদিক দিয়ে মহারাণীর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু নানাসাহেবের খবরটা ক্ষুরধার তরবারির মতো। ওই তরবারিটি যদি ভালো ক'রে শান দিয়ে কালেক্‌টার সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে তার এক কোপে মহারাণী মহেন্দ্রনাথ তুজনেই কাটা পড়বে। কিন্তু ওর মধ্যেও একটা কথা আছে। সায়েবরা সাধারণত কান-পাতলা হয় না, প্রমাণ দিতে না পারলে একথা বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যাপারে সমুদ্রবিলাস যে ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন একথা সবাই জানে, ইংরেজদের দফ্‌তরেও লেখা আছে সে কথা,

তাছাড়া নিমগাঁয়ের বিশ্বদেব শর্মাকে উৎখাত করতে তিনিই গিয়েছিলেন লোকজন নিয়ে, নিজে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে গ্রাম-ছাড়া করেছিলেন তাকে, তারপর পুলিশের দারোগাকে খবর দিয়েছিলেন। সবাই জানে একথা। সেই সমুদ্রবিলাসের মেয়ে নানাসাহেবকে শ্রদ্ধা করে, একথা কালেক্টার চট ক'রে বিশ্বাস করবে কি!

রঙ্গাবতীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ইদানীং বাইরের কোন অচেনা লোক কি অন্দরমহলে ঢুকেছিল?"

"ইদানীং ঢোকেনি। অনেকদিন আগে পারুবাবুর চিঠি নিয়ে কে একজন উদয়প্রতাপ রায় এসেছিল, তুমিও তো জান। দাউদপুরের মাঠে তাঁবু পড়েছিল তার—"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তবে লোকটাকে আমি দেখিনি। সদরে যেতে হয়েছিল সেদিন। কি রকম দেখতে বল তো?"

"বেশ সুপুরুষ। গোঁফ আছে। একটু কাটখোট্টা গোছের।"

"কি জন্যে এসেছিল?"

ফিক্ করে হেসে ফেললে রঙ্গাবতী।

"মহারাণীকে বিয়ে করতে। কিন্তু মহারাণী রাজি হয়নি।"

"তারপর কি হ'ল।"

"কি আর হবে, চলে গেল। তবে ব'লে গেছে আবার আসবে—"

"হুঁ।"

নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন। নাকের চুল টানতে টানতে রঙ্গাবতীর দিকেই চেয়েছিলেন তিনি। অন্যমনস্ক ভাবেই চেয়েছিলেন। হঠাৎ ভুরুটা কুঁচকে গেল তাঁর, রঙ্গাবতীকে যেন নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন। একটু আগে নানাসাহেবের খবরটা শুনে তলোয়ারের কথা মনে হয়েছিল, এখন রঙ্গাবতীকে দেখে আর একটা উপমা মনে হ'ল। শিখা। মনে হ'ল সীতার জন্য স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়েছিল, দ্রৌপদীর জন্য কুরুবংশ। তাঁর জীবনটাও পুড়ে

গেছে সুভাষিনীর রূপের জন্য। এই মেয়েটাকে কাজে লাগালে এও একটা অগ্নিকাণ্ড যে না করতে পারে তা নয়। পারে, খুব পারে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরিয়েছিলি কখনও?"

"না। মহারাণী তাঁর ত্রিসীমানায় কাউকে থাকতে দেয়নি। আমি লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনেছি এসব।"

"হুঁ।"

আবার নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন।

নেপথ্যে যে এমন একটা বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তা মহারাণী টের পায়নি। এসব দিকে তার মনও ছিল না, সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা রাহুর মতো যে সূর্যকে গিলতে চেয়েছিল সে সূর্য তার আকাশ থেকে অনেক আগে স'রে গেছে, সে নিজেই জোর ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে এখন সে-সূর্যের মহিমা দেখছে সে অন্য আকাশে। ভাবছে, যে আকাশেই থাকুক, সূর্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

বিয়ে হবার পর দেড় বৎসর কেটে গেল, শ্রীহর্ষ একবারও আসেনি। সে-ও আর নিমন্ত্রণ করেনি তাকে। সে কি নিজে মনে ক'রে আসতে পারত না একবার? যে লোক মুখে অত প্রেম জানাত, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে এতটা বদলে গেল সে! মিছে কথা বলত, বানিয়ে বানিয়ে কাব্যকথা আওড়াতো কেবল। ভালোবাসেনি। ভালোবাসলে নিজেকে বিলিয়ে দিত, লুটিয়ে দিত, ভাসিয়ে দিত, দেওয়াল টপ্‌কে সুড়ঙ্গ কেটে আসত, কুলমান জলাঞ্জলি দিত, কলঙ্ককে অলঙ্কার মনে করত, আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কৃতার্থ হ'ত। নিদারুণ ক্ষোভে, অপমানে আক্রোশে পুড়ছিল মহারাণীর অন্তরটা। তাকে এমন ক'রে তুচ্ছ করবে শ্রীহর্ষ? ইস, সামান্য

একটা টোলের পণ্ডিত, তার ভারী তো আত্মসম্মান। প্রেমের তুলনায় আত্মসম্মানের কি মূল্য আছে? প্রেম যদি সোনা হয় আত্মসম্মান পিতল, প্রেম যদি সাগর হয় আত্মসম্মান ডোবা! যেদিন হাট থেকে শ্রীহর্ষ প্রথম ছুটে এসেছিল তার কাছে সেদিনের কথা মনে পড়ে মহারাণীর। পাছে, ঘরজামাই হ'তে হয়, সেই ভয়েই অস্থির। না, ওর আর মুখ-দর্শন করবে না সে। কিছুতেই না।

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু টিকল না।

দু'দিন পরেই শৌরসেনী গেল নিমন্ত্রণ লিপি নিয়ে।

"অনেকদিন দেখিনি। একবারও কি মনে পড়ে না। এস বিকেলে।"

শ্রীহর্ষ কিন্তু নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন একটা—আবিষ্কার করেছিলেন মহারাণী তাঁকে যে মুক্তি দিয়েছে তার মূল্য কত। মহারাণী সম্বন্ধে তাঁর মোহ যে সম্পূর্ণ অপনোদিত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মহারাণীকে বিয়ে করলে তাঁকে দাসখৎই লিখে দিতে হ'ত। তাঁর ছোট মাটির ঘরে সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে তিনি যে সুখস্বর্গ গ'ড়ে তুলছিলেন সমুদ্রবিলাসের প্রাসাদে তা তিনি পারতেন না। বিয়ের বছর খানেক পরে বাবা মা দু'জনেই মারা যান। এক সঙ্গে একদিনে মারা গেলেন উভয়েই। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। তাঁর মা আগেই বলেছিলেন বৈধব্য-যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারবেন না, স্বামী আগে মারা গেলে সহমৃতা হবেন। সে মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখতে হয়নি তাঁকে। একবছর পুত্রবধূর সেবা-যত্ন ভোগ ক'রে তাঁর সংসারটি ভাল ক'রে গুছিয়ে দিয়ে তবে তাঁরা চলে গেলেন। সংসারে অভাব-অনটন অনেক ছিল। ভবভূতি ভট্টাচার্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে বৈষয়িক উন্নতি করতে পারেন-

নি তেমন তবু শ্রীহর্ষকে যে সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছিলেন তা সুখের সংসার ছিল। শ্রীহর্ষ এ-ও বুঝেছিলেন যে মহারাণী জোর ক'রে ফাঁদটা সরিয়ে না নিলে তিনিও এতদিন তার বাঘ-সিংহের মতো একটা খাঁচার বন্দী হয়ে থাকতেন। এই সত্যটা আবিষ্কার করার পর থেকে মহারাণীর সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা তিনি পোষণ করতে লাগলেন তা অবর্ণনীয়। এর পর থেকেই সম্ভবত তিনি মনে মনে মহারাণীর কেনা-গোলাম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই মনোভাবের ষোল-আনাই যে কৃতজ্ঞতা তা মনে করলেও ভুল হবে, তিনি এটাকে কৃতজ্ঞতা বলেই ধ'রে নিয়েছিলেন, সর্বমঙ্গলা কিন্তু ভুল করেনি। শ্রীহর্ষের কথা-বার্তা থেকে সে টের পেয়েছিল যে শ্রীহর্ষের ছেলেবেলার সঙ্গিনী মহারাণীর রাজত্ব শুধু তার জমিদারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

...অনেকদিন পরে চিঠি পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। অবাক হয়ে গেলেন নিজের মনের দিকে চেয়ে, অন্তরের গহনলোকে কে যেন এই আমন্ত্রণটুকুর জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল। ছোট্ট চিঠিটা পেয়ে তার হৃদয়ের স্পন্দন-বেগ এমন বেড়ে গেল কেন। যেটাকে ভস্মস্তূপ মনে হচ্ছিল, একটা দমকা হাওয়া যেন সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল প্রচ্ছন্ন আগুনটা।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর সহসা স্থির করলেন, লুকিয়ে যাবেন না, সর্বমঙ্গলাকে বলেই যাবেন।

সর্বমঙ্গলা মেয়েটি রূপসী তো বটেই, বুদ্ধিমতীও। একটু চাপা স্বভাবের, কথা কম বলে, কিন্তু যেটুকু বলে বেশ বাগিয়ে বলে। খবরটা শুনে সে চুপ ক'রে রইল, তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল একটু।

"হাসছ যে—। যাব না?"

"যাবে বই কি। ছেলে-বেলার সই ডেকেছে, না গেলে কি চলে।"

"তবে অমন ক'রে হাসলে যে।"

"হাসলাম মনের দুঃখে, নিজের কপালের কথা ভেবে। তোমার সঙ্গে আমাকেও যদি নেমন্তন্ন করত, রাজবাড়িতে দুটো ভালোমন্দ জিনিস খেয়ে আসতাম।"

"বেশ তো চল না। তুমি গেলে মহারাণী খুব খুশী হবে।"

"হবে না। হ'লে নেমন্তন্ন করত। তাছাড়া আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে ওকে। শুনছি ও নাকি আজকাল সিংহটার পিঠে চ'ড়ে বেড়ায়।"

"তাই নাকি। শুনিনি তো।"

সর্বমঙ্গলা আর কিছু বলল না, মুচকি হেসে চলে গেল।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন অন্দরমহলের দরজার কাছে শৌরসেনী দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে বলল, "আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছি। মা খিড়কির বাগানে আছেন, আপনি সেইখানেই যান। রাস্তাটা চেনেন তো, আমাদের ওখানে যাবার হুকুম নেই।"

"রাস্তা চিনি।"

খিড়কির বাগানে গিয়ে শ্রীহর্ষ যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সর্বমঙ্গলা ঠিকই বলেছে তো, মহারাণী সত্যিই সিংহটার পিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে! আশ্চর্য হলেন, কিন্তু মুগ্ধও হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। মনে হ'ল অপরূপ! জগদ্ধাত্রী যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীহর্ষ একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন নির্বাক হয়ে। অনেকদিন মহারাণীকে দেখেননি তিনি, এমন অপ্রত্যাশিত মহিমময়ী মূর্তিতে দেখতে পাবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দেখলেন মহারাণী শুধু সিংহটার পিঠে চড়েই বেড়াচ্ছে না ঝুঁকে ঝুঁকে আদরও করছে তাকে। পাশের পশুমহল থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক আর বাঘের গর্জন। হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষকে।

"আরে, কতক্ষণ এসেছ তুমি। ডাকনি কেন। দাঁড়াও মহারাজকে রেখে আসি। এক্ষুনি আসছি। কষ্টি, কোথা গেলি তুই—"

সিংহের পিঠে চড়েই মহারাণী পশু-মহলের দিকে চলে গেল। একটু পরেই শোনা গেল সিংহের গর্জন। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে। "চল ছাতে যাই—"

"তোমাকে দেখে সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছি আজ। সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছ! এ কি কাণ্ড!"

"কোন মানুষ তো আমাকে আমল দিলে না, তাই ওদের নিয়েই আছি। মহারাজ আমাকে ভালবাসে খুব। তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে। যা বলি তাই করে—"

মহারাণী একথা বললে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ ছিল তার। সে জানত মহারাজ তাকে সহ্য করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু সে কথা শ্রীহর্ষকে বলবে কেন, নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইত না।

ছাতে রঞ্জাবতী দাঁড়িয়ে ছিল সেজেগুজে।

"শ্রীহর্ষের জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর। আর ফুলের তোড়া তৈরি করে দে কয়েকটা ভাল করে। সর্বমঙ্গলাকে পাঠাব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রঞ্জাবতী নেবে গেল।

শ্রীহর্ষ হেসে বললেন, "গরীবের কুঁড়ে ঘরে ফুলের তোড়া বৃথা পাঠাবে। আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় আর সর্বমঙ্গলার কাটে রান্নাঘরে আর সুতো কেটে। যে পরিবেশে ফুলের তোড়া মানায় সে পরিবেশ আমার বাড়ীতে নেই।"

মহারাণীর মুখে একটা ছায়া নামল, কিন্তু সেটা ঢাকবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। তারপর সোজা চলে গেল একটা পুষ্পিত জুঁই ঝাড়ের দিকে। শ্রীহর্ষের জীবনের একটা দিক সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল তার কাছে। তার মনে হ'ল শ্রীহর্ষ যদি তাকে বিয়ে করত তাহলে তার দারিদ্র্য ঘুচে যেত। শ্রীহর্ষ তো বিয়ে করতে

চেয়েছিল, সেই করেনি। মহারাণীর মনে হ'ল ওর এ দারিদ্র্যের জন্য আমিই দায়ী। জুঁই ফুল তুলতে তুলতে এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল তার ঘুরে ফিরে।

…একমুঠো জুঁই ফুল তুলে এনে বললে, "নাও।"

দু'হাত পেতে ফুলগুলি নিলেন শ্রীহর্ষ।

"তোমাকে আজ কেন ডেকেছি জান?"

"না। আমিও সেকথা জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। কেন বল তো—"

"নিজের মানের দায়ে।"

সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্প বানিয়ে তুলেছিল মহারাণী জুঁই ফুল তুলতে তুলতে।

"মানের দায়ে? কি রকম।"

"মহেন্দ্রনাথ এসেছিলেন কয়েকদিন আগে। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর বাবার নামে এখানে একটা ভাল টোল হোক আর তুমি সে টোলের ভার নাও। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি তোমাকে রাজি করাব। রাজি হবে তো—"

"আমার চেয়ে যোগ্যতর লোক রয়েছেন নীলকণ্ঠ বাচস্পতি মশায়। তিনি ভার নিলে টোলের গৌরব অনেক বেশী হবে।"

"কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ঝোঁক তোমার উপর। আর আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। রাজি হবে তো—"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল মহারাণী।

"ভেবে দেখি—"

"না, ভাবতে দেব না আমি, এখুনি 'হাঁ' বলতে হবে। আচ্ছা, আমার কথার কি মূল্য নেই তোমার কাছে! মহেন্দ্রনাথ উপকারী বন্ধু একজন, সমস্ত বিষয়ের ভার নিয়েছেন, সমস্ত ঝক্কি পোয়াচ্ছেন। তাঁর এ সামান্য শখটুকু মেটাতে দেবে না তুমি! আর আমি তাকে কথা দিয়েছি।"

মহারাণীর কণ্ঠস্বরে উত্তাপের আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন

শ্রীহর্ষ। তারপর হেসে বললেন, "বেশ, তোমার যখন অত জেদ, তাই হবে।"

এরপর মহারাণী যা করল তা-ও অদ্ভুত। হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "জুঁই ফুলগুলো আমার খোঁপায় গুঁজে দাও।"

শ্রীহর্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল একটা। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন! ছেলেবেলায় এমনি ক'রে অনেকবার ফুল পরিয়ে দিয়েছেন তার খোঁপায়। কিন্তু তখন তো সর্বমঙ্গলা ছিল না। ফুল-পরানো শেষ করেই তিনি উঠে পড়লেন, বিবেক দংশন করতে লাগল।

"আমি এবার যাই—"

"এত তাড়াতাড়ি যাবে? কিছু তো খেলে না।"

"না, খাবার ইচ্ছে নেই এখন।"

"সর্বমঙ্গলার জন্য ফুল নিয়ে যাও। তোড়া বাঁধতে বললাম যে—"

"পাঠিয়ে দিও।"

যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ভাবতে ভাবতে গেলেন খোঁপায় ফুল-গোঁজার কথাটা সর্বমঙ্গলাকে বলবেন কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেননি।

...মহারাণী প্রস্তর মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে। রঞ্জাবতী খাবার আনতে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। ধমকে উঠল তাকে। "এত দেরি কেন? শ্রীহর্ষ তো চলে গেল—"

দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জাবতী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায়।

"দে আমাকে—"

থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে মহারাণী চলে যাচ্ছিল খিড়কির বাগানের দিকে।

"ফুলের তোড়া তৈরি করব?"

"না, আর করতে হবে না। মালা গাঁথা আছে?"

"আছে—"

"তাই দে তাহলে"

মালা আর খাবারের থালা নিয়ে মহারাণী সোজা চলে গেল সিংহের মহলে। কষ্টি সবিস্ময়ে দেখল মহারাণী সিংহের গলায় মালা পরিয়ে জোর করে তাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। মহারাজ কিছুতেই খাবে না, মহারাণীও না-ছোড়। কষ্টি আবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে তিনবার।

এসব তার ভাল মনে হচ্ছিল না মোটেই।

সেইদিনই একটু পরে চিঠি নিয়ে লোক গেল মহেন্দ্রনাথের কাছে। মহারাণী কখনও বড় চিঠি লেখে না। চিঠিতে ভনিতাও থাকে না কোন। মুক্তোর মতো অক্ষরে সোজা মনের ভাব ব্যক্ত করাই তার স্বভাব। চিঠি গেল—"বৈষয়িক প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দয়া ক'রে যদি আসেন বাধিত হব।"

মহেন্দ্রনাথ চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহারাণীর বিষয়ের সব খবরই তো তাঁর নখ-দর্পণে, কোনরকম গোলমালের কথা তো কানে যায়নি, তবে হঠাৎ কি এমন বৈষয়িক প্রয়োজন ঘটল? চিঠিখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ ক'রে তিনি তৎক্ষণাৎ হাতী কসতে বললেন। নিজের প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারাণী তাঁকে এই প্রথম চিঠি লিখেছে। চিঠি লিখে এমন ভাবে আর কখনও যেতে বলেনি তাঁকে। তিনিই বারবার গিয়ে বসেছেন গোল বৈঠকে, কখন সত্যকার বৈষয়িক প্রয়োজনে, কখনও বা সেই ওজুহাতে। আজ মহারাণীর এ ডাক কেন? গোল বৈঠকের পরদা আজ সরে যাবে না কি! একটু সাজ-সজ্জা করেই গেলেন তিনি সেদিন।

মহারাণীর খাস চাকরাণী শৌরসেনী যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। সে তাঁকে গোল-বৈঠকে নিয়ে গিয়ে যথারীতি খাতির করে বসালো। একটু পরেই পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের শিঞ্জিনী।

"নমস্কার। প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, আপনাকে কষ্ট দিলুম ব'লে।"

"এরকম কষ্ট পাবার জন্যেই তো উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি রোজ। প্রয়োজনের কথাটা আগে বলুন শুনি। আমি যতদূর জানি, আপনার সম্পত্তি ঠিক আছে—"

"আমার সম্পত্তি ঠিক থাক বা না থাক সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আমি আপনাকে ডেকেছি অন্য একটা প্রয়োজনে।"

মহেন্দ্রনাথের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠল। কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি।

"আপনার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বলুন। আগেই তো বলেছি আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।"

"আপনি আমাদের গ্রামের শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে চেনেন কি?"

"খুব। মস্ত পণ্ডিক লোক তিনি।"

"আপনি জানেন কি না জানিনা, ওঁর সঙ্গে আমার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আজ উনিই এ বিষয়ের মালিক হতেন। এখন শুনছি দারিদ্র্যের চাপে বড় কষ্টে আছেন তিনি। তাই আমার ইচ্ছে তাঁকে একটা টোল ক'রে দেওয়া আর সেই সঙ্গে একশ' বিঘা নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করা।"

"উত্তম প্রস্তাব। এ তো অতি সহজেই হতে পারে।"

"যত সহজে ভাবছেন তত সহজে নয়। শ্রীহর্ষ যদি শোনে যে আমি তার দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য তাকে দয়া ক'রে এই সব দিচ্ছি তাহলে সে কিচ্ছু নেবে না। দানটা করবেন আপনি, জমিও আপনার জমিদারী থেকেই দিতে হবে, এর জন্যে যা মূল্য লাগে তা আমি দেব।"

"এই তো আমার প্রতি অবিচার ক'রে বসলেন। আমি কি এতই অধম যে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে এই সামান্য দানটুকু ক'রে পুণ্যার্জ্জন করবার অধিকার আমার নেই? এর জন্যে দাম নিতে হবে!"

"কিন্তু আপনার আর্থিক ক্ষতি করবার কি অধিকার আছে আমার বলুন। এমনিই আপনি আমার জন্যে যা করছেন তার তুলনা নেই।"

"আপনার যে কি অধিকার আছে তা আপনি জানেন তো। আপনার এ আদেশ পালন ক'রে কৃতার্থ হব আমি।"

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন মহেন্দ্রনাথ অন্দর থেকে বেরুচ্ছিলেন তখন ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পাশের একটা দরজা দিয়ে ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেল কে যেন। দেখতে পেলেন শুধু বেল-ফুলের মালা-জড়ানো দোদুল্যমান বেণীটি, গৌরবর্ণ নিটোল মুখের পাশটুকু, আর নীলাম্বরী শাড়ির জরি-ঝলমল উড়ন্ত আঁচলখানা। মহারাণী কি? মহারাণীকে আবছা-ভাবে দেখেছিলেন তিনি অনেকদিন আগে, এখন সামনাসামনি দেখলেও চিনতে পারবেন না বোধহয়। শৌরসেনী আলো ধ'রে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন, তখন সে-ও দাঁড়াল। মহেন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে একবার, দেখলেন তার মুখ ভাব-লেশ-হীন, আনত-নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শৌরসেনীর স্বভাবই এই। তাকে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলেন না তিনি। কিন্তু তাঁর মানস-পটে এই সন্ত্রস্তা সহসা অন্তর্হিতা তরুণীর ছবিটি আঁকা হয়ে গেল, চোখের সামনে দুলতে লাগল বেণীটি, সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ফুলের যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, সে গন্ধ তাঁর বুকের ভিতর বাসা বাঁধল। মহেন্দ্রনাথের চিত্ত নূতন নারী-সঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে অনেকদিন থেকে। তৃতীয় সন্তান হবার পর থেকে বেদানার শরীর ভেঙে পড়েছে। যৌবনে একদা যে রঙের নেশা চোখে লেগেছিল তা ফিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। কর্তব্যবোধেই বেদানাকে তিনি ত্যাগ করেননি। তার নামে বিষয় লিখে দিয়েছিলেন, তার ও তার সন্তানদের ঐহিক সুখ-সুবিধার

সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু ভালবাসার সে জাদু আর নেই। এখন ক্বচিৎ তিনি বেদানা-মহলে যান। তিনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন, নূতন প্রণয়িনী জোটাতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি, কারণ তিনি আশা ক'রে আছেন মহারাণীকে পাবেন। ওই দুর্জয়িনীকে জয় করতেই হবে যেমন ক'রে হোক, এই তাঁর পণ। তাই নিজের চরিত্র-মহিমাকে যতদূর সম্ভব শুভ্র, সমুজ্জ্বল এবং সমুন্নত ক'রে রেখেছেন। সেদিক দিয়ে মহারাণী যেন কোন খুঁত ধরতে না পারে, আপনিই যেন সে আকৃষ্ট হয় তাঁর দিকে। সেদিন যেতে যেতে বার বার তাঁর মনে হ'তে লাগল, কে ওই রূপসী মেয়েটি, ওই কি মহারাণী? কিন্তু না, মেয়েটি মহারাণী নয়, রঞ্জাবতী। কিশোরীমোহনের ইঙ্গিতে রঞ্জাবতী মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, ভেবেছিল একাই বুঝি বেরুবেন তিনি অন্দরমহলের পথ দিয়ে। সঙ্গে শৌরসেনী থাকবে তা তার খেয়াল ছিল না। মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর মহারাণী খানিকক্ষণ ছাদে একা বসে রইল। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্য-গগনে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল সে। হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড হ'ল, চাঁদের যেন ঘন কুঞ্চিত দাড়ি গজাল, তারপর বাবরি, তারপর চোখ নাক মুখ—চাঁদ? না, শ্রীহর্ষ।

সেদিকে চেয়ে মহারাণী মনে মনে বলছিল, সত্যিই কি সুন্দর তুমি! কিন্তু কত দূরে আছ, কিছুতেই তোমার নাগাল পাচ্ছি না।

মাসখানেকের মধ্যেই মহা-সমারোহে টোল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ও অঞ্চলের মান্যগণ্য পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়ে সভা করলেন, জয়-কামনা করলেন অধ্যাপক শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের, সাধুবাদ করলেন জমিদার মহেন্দ্রনাথের বদান্যতার। উৎসব যখন শেষ হয়ে গেল, পণ্ডিতের দল যখন বিদায় নিলেন একে একে, মহারাণীর জন্য

অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা ক'রে মহেন্দ্রনাথও যখন হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে চ'লে গেলেন, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ আশা ক'রে এসেছিলেন এই উপলক্ষে মহারাণীর সঙ্গে হয়তো আলাপ হবে। কিন্তু মহারাণী এল না। ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

সেদিনও পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। হঠাৎ হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো শব্দে সচকিত হয়ে উঠল শ্রীহর্ষের নব-নির্মিত চতুষ্পাঠীর বিস্তৃত প্রাঙ্গন, তারপর মনে হ'ল খানিকটা জমাট জ্যোৎস্না যেন এসে থামল সেখানে। মহারাণীর বিয়ের জন্য সমুদ্রবিলাস একদা আগাগোড়া রূপোর পাত দিয়ে মুড়ে যে পালকিটি করিয়েছিলেন, যা এতদিন অনাদৃত হয়ে একটা ঘরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল সেই পালকিটি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না বিকিরণ করতে করতে এসে দাঁড়াল শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের দ্বারে।

শ্রীহর্ষ বাড়িরে ভিতরে ছিলেন, শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। তিনিও মনে মনে প্রতীক্ষা করছিলেন মহারাণীর।

বরকন্দাজ সেলাম ক'রে নিবেদন করল, "রাণীমা এসেছেন।"

মহারাণী বেরিয়ে এলেন পালকির ভিতর থেকে।

অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীহর্ষ ডাকলেন "ওগো, এদিকে এস। দেখ, কে এসেছে। শুনছ—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রীহর্ষ।

"'ওগো'কে বাইরে আর না-ই ডাকলে। চল, আমরাই ভিতরে যাই।"

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন শ্রীহর্ষ।

সর্বমঙ্গলাও এসে দাঁড়িয়েছিল দ্বার-প্রান্তে।

পালকির সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার চোখ ধেঁধে গেল।

মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"ওটা কি!"

মহারাণী হেসে উত্তর দিলে—"রূপোর পালকি। লক্ষ্ণৌ থেকে কারিগর আনিয়ে বাবা শখ ক'রে করেছিলেন ওটা। বিয়ের পর প্রথম ওইটেতে চ'ড়ে শ্বশুর বাড়ি যাব ব'লে। কিন্তু বিয়ে তো অদৃষ্টে নেই, এতদিন ওটা বোরখা-ঢাকা পড়ে ছিল একটা ঘরে। আজ ইচ্ছে হ'ল ওইটে চড়েই তোমাদের কাছে যাই—"

"আসুন, কি ভাগ্যি আমাদের।"

"সত্যই তুমি ভাগ্যবতী।"

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে মহারাণী একজন বরকন্দাজকে আদেশ করল—"পালকির ভিতর যে বাক্সটা আছে, ভিতরে দিয়ে যাও সেটা।"

আবলুশ কাঠের উপর সোনার কাজকরা একটা বড় বাক্স দিয়ে গেল জাফর।

"ওটা কি?"

শ্রীহর্ষ জিগ্যেস করলেন সভয়ে।

"বলছি, ঘরের ভিতরে চল। শোবার ঘর কোন্‌টা তোমাদের?"

"এই যে—"

শ্রীহর্ষ আর সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে সে ওদের শয়নকক্ষেই ঢুকল। অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন দুটি বিছানা ছিল ঘরের দুধারে।

সর্বমঙ্গলা আর মহারাণী একটা খাটে বসল। শ্রীহর্ষ সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল

"তুমিও বস ওই খাটটাতে।"

শ্রীহর্ষ বসতেই মহারাণী বলল, "এইবার আমার দরখাস্তটি পেশ করি অধ্যাপক মশায়ের কাছে। তোমার নতুন টোলে আমিও ভরতি হ'তে এসেছি। তোমার কাছে কাব্য পড়ব—"

শ্রীহর্ষ একটু বিস্মিত এবং বিব্রত হলেন।

মুখে অবশ্য বললেন, "বেশ তো—"

সর্বমঙ্গলা মুচকি হাসতে লাগলেন, কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল যে

তার মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল হঠাৎ। শ্রীহর্ষও লক্ষ্য করলেন সেটা। হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠল মহারাণী।

"কি বোকা তোমরা দুজনেই। সত্যি বিশ্বাস করলে যে আমি এখানে এসে কুশাসনে ব'সে কাব্য পড়ব? ছেলেবেলায় মাধব পণ্ডিতের কাছে অনেক পড়েছি, আর পড়বার সাধ নেই। আমি এসেছি অন্য কাজে, সর্বমঙ্গলার কাছে।"

"আমার কাছে? কি বলুন।"

"বল, আমায় হতাশ করবে না।"

"সে সাধ্য কি আছে আমার!"

"ওই যে বাক্সটা এনেছি ওতে কিছু গয়না আছে। আমার বিয়ের জন্য বাবা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে তো হ'ল না। যে লোক আমার গায়ে গয়না দেখে খুশী হ'ত সে তো নাগালের বাইরে চলে গেল। তাই ভাবছি গয়নাগুলো আজ তোমাকেই পরিয়ে দেব। শ্রীহর্ষ দেখে খুশী হবে, আর শ্রীহর্ষ যদি খুশী হয় তাহলে আর বাকি রইল কি—

মহারাণীর চোখ থেকে হাসি উপছে পড়তে লাগল।

সর্বমঙ্গলা ব'সে রইল নত-নেত্রে।

শ্রীহর্ষ বললেন, "এমনিই তো তোমার কাছে অনেক ঋণে ঋণী আছি। আবার বোঝা বাড়াচ্ছে কেন?"

"আমার বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিচ্ছি। আর কাকে দেব বল। বাধা দিও না তুমি।"

মহারাণীর চোখ দুটো তখনও হাসছিল, কিন্তু গলার স্বরে বাজল মিনতির সুর।

"আমি এত সব দামী জিনিস রাখব কোথায়?

"সে ব্যবস্থাও হবে।"

....সর্বমঙ্গলাকে গয়নাগুলি পরিয়ে সেদিন মহারাণী যখন ফিরল তখন রাত্রির তৃতীয় যাম প্রায় শেষ হচ্ছে। পূর্ণচন্দ্র হেলে পড়েছে

পশ্চিম গগনে। একটা ফিঙে পাখীর তীব্র মধুর স্বরে জ্যোৎস্না কাঁপছে।

দু'দিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। অবাক হয়ে গেল কষ্টি, কারণ সে-ই ছিল এ দৃশ্যের একমাত্র দর্শক। একটা তেঁতুল গাছে উঠে সে তেঁতুল পাতা চিবুচ্ছিল বসে বসে। তার বন্য স্বভাব ঘোচেনি। প্রায়ই গাছের উপর উঠে বসে থাকত সে। আর তেঁতুল পাতা ছিল তার প্রিয় খাদ্য। হঠাৎ দেখতে পেলে মহারাণী সিংহের মহলে ঢুকেছে। সিংহটা গম্ভীর হয়ে বসেছিল, মহারাণীকে দেখে সে ল্যাজটি মাটিতে আছড়াল দু'একবার, আর কিছু করল না।

"এগিয়ে আয় এদিকে।"

সিংহ এগিয়ে এল কিন্তু অনিচ্ছাসহকারে।

"পায়ে মাথা রাখ।"

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা সে কিছুতেই নত করবে না।

"হাত জোড় কর।"

তা-ও করল না সে।

মহারাণী তখন অধীরভাবে চড়ল তার পিঠের উপর, জড়িয়ে ধরল তার গলা। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গর্জন করতে শুরু করল পাশের মহলে, ময়ূরের তীক্ষ্ণ কেকাও চিরে দিতে লাগল আকাশকে। রোজ যেমন হয়, সেদিনও তাই হ'তে লাগল। মহারাজ কিন্তু একটুও বিচলিত হ'ল না। তার গাম্ভীর্য রোজ যেমন অটুট থাকে সেদিনও তেমনি রইল।

"শুনচিস, দেখচিস ওরা কি করছে। ওদের কাছে শেখ, আয় দেখবি। দেখ্ ওরা কেমন ক'রে আমাকে আদর করে।"

তারপর যা করল মহারাণী তাতে শিউরে উঠল কষ্টি।

সিংহটাকে টানতে টানতে সে তাকে নিয়ে গেল বাঘের ঘরে।

তারপর সেখানে নিয়ে এল ময়ূরটাকেও। তারপর মহারাণী উন্মাদের মতো নাচতে লাগল তাদের সামনে। কষ্টির মনে পড়ল টাকুমাকে, সে-ও অমনি ক'রে নাচত। ময়ূরটাও নাচতে লাগল। বাঘটা মহারাণীর কাঁধে থাবা তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল বারবার।

মহারাজ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গম্ভীর হয়ে।

"দেখ্ দেখ্ দেখ্ তুই—"

পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল মহারাণী। মনে হ'ল যেন আর্তনাদ করছে। ঠিক এর পরেই বজ্রপাত হ'ল। মহারাজের বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে উঠল চতুর্দিক। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়ূরটার উপর এবং নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে। তারপর লাফিয়ে পড়ল বাঘটার উপর। মহারাণী চীৎকার ক'রে স'রে গেল একধারে। বাঘ আর সিংহের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তুমুল যুদ্ধ। গর্জনে সমস্ত খিড়কির বাগানটা কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু। বাঘটাও কম শক্তিশালী ছিল না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাগালের মধ্যে পেয়ে সে-ও প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু প্রাণটা গেল তার শেষ পর্যন্ত। মহারাজই জিতল। থাবা দিয়ে বাঘের গলা আর বুক চিরে ফেললে সে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

"আমাকেও মেরে ফেল তুই, আমাকেও খেয়ে ফেল।"

মহারাণী তার পিছু পিছু ছুটে এসে শুয়ে পড়ল তাকে জড়িয়ে। মহারাজ কিছু বললে না। ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়তে লাগল শুধু, তার গলা থেকে বেরুতে লাগল গরগর গরগর শব্দ।

কষ্টি তেঁতুলগাছের উপরে বসেই আবার মাথা নাড়লে তিনবার।

আর এক কাণ্ড হ'ল।

মহারাণী যখন সিংহের মহলে তখন মহেন্দ্রনাথের পালকি এসে ঢুকল বাইরের সিংহদরজায়। মহেন্দ্রনাথ আসবার পূর্বে সাধারণত

খবর দিয়ে আসতেন। কিন্তু সেদিন আর খবর পাঠাবার সময় হয়নি, সম্ভবত খবর পাঠানো দরকারও মনে করেননি তিনি। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন ম্যানেজার কিশোরীমোহনের ঘরে। যদিও তিনি মহারাণীর বিষয়ের ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু কিশোরীমোহনকে ম্যানেজারি-পদ থেকে অপসারিত করেননি। আপাতদৃষ্টিতে সব বিষয়ের ভারই কিশোরীমোহনের উপর ছিল, কিন্তু কিশোরীমোহন জানতেন চাবিকাটি মহেন্দ্রনাথের হাতে আছে। এতে তিনি মনে মনে জ্বলছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করবার উপায় ছিল না, সাহসও ছিল না। যখন একা থাকতেন তখন নাকের চুল টানতে টানতে চিন্তা করতেন কি ক'রে এর প্রতিকার করা যায়। কিন্তু কোন উপায়ই মাথায় আসত না।

মহেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। কালেক্‌টার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন নানাসাহেব নাকি এই অঞ্চলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা যেন অচেনা লোক দেখলেই তাকে ধরে থানায় পাঠিয়ে দিই। আপনি আপনার স্টেটের মহলে মহলে খবরটা জারি ক'রে দিন। নানাসাহেবকে ধরে দিতে পারলে সরকারে আমাদের প্রতিপ্রত্তি খুব বেড়ে যাবে। মহারাণীকেও খবরটা বলে যাব, ভিতরে একবার খবর পাঠান।"

"যে আজ্ঞে।"

কিশোরী নিজেই উঠে বাইরে গেলেন। অন্দরমহলে খবর পাঠাবার বিশেষ পদ্ধতি ছিল। বাহির মহল যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা ঘরের ভিতর দড়ি টাঙানো থাকত। সেই দড়ি টানলেই অন্দরমহলে ঘণ্টা বেজে উঠত। তখন একজন দাসী এসে অন্দরমহলের কপাট খুলে খবর নিত কি চাই। তার মারফতই খবর পাঠাতে হ'ত।

...দাসী গিয়ে যখন মহারাণীর মহলে খবর দিল তখনও মহারাণী

সিংহের মহল থেকে ফেরেনি। সে মহলে কারও যাবার হুকুম ছিল না। তাই শৌরসেনী বলল, "ওঁকে পাঠিয়ে দাও, উনি এসে বসুন, রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন, এখুনি আসবেন।" মহেন্দ্রনাথকে শৌরসেনী যথারীতি অভ্যর্থনা করে পরদা-ঘেরা গোল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর গেল পশু-মহলের দিকে, যদি কষ্টির দেখা পায়, খবরটা পাঠাতে পারবে। কষ্টি কিন্তু তখন তেতুল গাছের পত্রপল্লবান্তরে আত্মগোপন ক'রে বসেছিল। তাকে দেখতে না পেয়ে পশু-মহলের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগল শৌরসেনী, আর ভাবতে লাগল ওখানে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে আজ। এদিকে গোল-বৈঠকে আর এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। মহেন্দ্রনাথ যখন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন তখন রঞ্জাবতী ধীরে ধীরে পরদা সরিয়ে ভিতরে সন্তর্পণে উঁকি দিল একবার। চোখাচোখি হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে। মহেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। ওই নীলাম্বরী, ওই ফুলের-মালা-জড়ানো সর্পিল বেণী তো' তিনি দেখেছেন আর একদিন।

"শুনুন—"

ক্ষণকাল আনত-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জাবতী, তারপর সরমশঙ্কিত ধীর পদক্ষেপে ভিতরে এসে ঢুকল। মহেন্দ্রনাথের সন্দেহমাত্র হ'ল না এই রূপসী মহারাণী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে।

সাগ্রহে তার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

"আজ যে এ সৌভাগ্য হবে তা আসবার সময় কল্পনাও করতে পারিনি।"

রঞ্জাবতীর মাথা আরো একটু নত হ'ল।

আর একটু এগিয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

"দুটি খুব গুরুতর প্রয়োজনে হঠাৎ আসতে হ'ল আজ। খবর দেবার সময় পাইনি। কালেক্‌টার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন যে তাদের চর নাকি সন্ধান এনেছে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন

ক'রে আছে, আমরা যেন তাকে ধরবার সমুচিত চেষ্টা করি। আমি বাইরে দামামা পিটিয়ে আমাদের জমিদারীতে একথা ঘোষণা করে দিয়েছি, কিশোরীবাবুকেও বলে গেলাম তাই করতে। এসব করতেই হবে লোক-দেখানো। কিন্তু সত্যিই আমরা চাই না যে নানাসাহেবের মতো বীর ইংরেজের হাতে ধরা পড়ুক। খবর পেয়েছি নানাসাহেব দু'এক জায়গায় নাকি অন্দরমহলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে বলতে এলাম যদি আপনার অন্দরে এসে পড়েন—"

রঙ্গাবতী মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমাকে আপনি ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।"

অভিভূত হয়ে পড়লেন মহেন্দ্রনাথ।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "এই কথা শোনবার প্রত্যাশাতেই তো এতকাল কাটিয়েছি। বেশ, তাই হোক তাহলে। তোমাকে বলে যাচ্ছি নানাসাহেব হঠাৎ যদি তোমার অন্দরে এসে পড়েন, তাঁকে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থাটা কোরো। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয়, খবর পাঠিও।"

রঙ্গাবতী চুপ ক'রে রইল।

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার দ্বিতীয় খবরটি খুব মর্মান্তিক। বেদানা কাল রাত্রে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে। পড়ছি শোন।"

মহেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রবল প্রতাপেষু—

অসংখ্য প্রণামান্তে দাসীর বিনীত নিবেদন, পাখী অনেকদিন পূর্বেই উড়িয়া গিয়াছে জানিতাম, কিন্তু তবু আশা করিয়াছিলাম হয়তো সে আবার আসিয়া তাহার সোনার খাঁচাটিতে ঢুকিবে। সেই

আশাতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু সে আর আসিল না ইহাও বুঝিয়াছি আর আসিবে না। তাই স্থির করিলাম আপনার সুখের পথে কণ্টক হইয়া আর আমি থাকিব না। ফুলের পাপড়ি অনেকদিন আগেই ঝরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে তাহা কেবল কাঁটা। আমি আপনার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য সম্পদ, তাহাতেই আমি কৃতার্থ, তাহা লইয়াই বাকি জীবনটা আমার কাটিয়া যাইবে। আপনার কৃপায় আমার আর্থিক অভাবও নাই। তাই আমি আমার ছেলেমেয়েদের লইয়া চলিলাম। যদি উহাদের মানুষ করিতে পারি, উহাদের পিতৃত্ব আপনি যদি ভবিষ্যতে স্বীকার করেন, উহারা আপনার কাছে ফিরিয়া আসিবে। আমি চলিলাম। শেষ অনুরোধ, আমাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। আমার অসংখ্য প্রণাম লউন। ইতি বেদানা।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন মহেন্দ্রনাথ।
"চিঠিটা তোমার কাছেই রেখে দাও। বিশ্বাস কর এ চিঠি সে নিজেই লিখেছে, আমি তাকে দিয়ে লেখাইনি।"
চিঠি হাতে করে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জাবতী।
আর একটু অপেক্ষা করে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "বেদানাই আমাদের মিলনের বাধা ছিল। সে যখন স্বেচ্ছায় স'রে গেল তখন আমি আশা করতে পারি কি—"
রঞ্জাবতী মাথা নত করল আবার।
মহেন্দ্রনাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবেগভরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।
...মহেন্দ্রনাথ গোলঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেলেন তখন বাইরের দালানে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। নীচে নেবে দেখলেন শৌরসেনী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিতে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছে। তার সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি

জানতেও পারলেন না, যে মহারাণী পরদার আড়াল থেকে সব দেখেছিল সব শুনেছিল। শুধু যে সেই দিনই জানতে পারলেন না তা নয়, অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারেননি।

তার পরদিনই মহারাণী তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা প'ড়ে তাঁর সামান্য একটু খটকা লেগেছিল অবশ্য। চিঠিতে সাক্ষাতের উল্লেখমাত্র ছিল না। মহারাণী যা লিখেছিল তা-ও একটু অদ্ভুত ঠেকল তাঁর কাছে। মহারাণী লিখেছিল, "একটি ভালো ছুতোর মিস্ত্রি চাই! আমাদের অনেকগুলো পালকি বে-মেরামত হয়ে প'ড়ে আছে। সেগুলোকে নিজের সামনে নিজের পছন্দ অনুসারে মেরামত করাব। মিস্ত্রিটি বিশ্বাসী হওয়া চাই, বোবা হলে আরও ভালো হয়।"

বোবা মিস্ত্রি অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে একটি বিশ্বাসী লোককেই পাঠিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। যথাসময়ে খিড়কি-বাগানের পশ্চিম-প্রান্তের খালি জায়গাটায় সারি সারি কুড়িটি পালকি জমা হ'ল এবং মহারাণীর তত্ত্বাবধানে সুবল মিস্ত্রি সেগুলি মেরামত করতে লাগল। ওই নিয়েই মেতে রইল মহারাণী কিছুদিন।

মুশকিলে পড়ে গেল রঙ্গাবতী। সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পরই মহারাণীর ঘরে ডাক পড়ল তার।

ঘরে ঢুকতেই মহারাণী তাকে বললে, "তুমি ছিলে কুড়োনী, হয়েছ রঙ্গাবতী। আরও কিছু হবার ইচ্ছে আছে না কি? যদি থাকে আমি আপত্তি করব না, বেদানা-মহল খালি হয়ে গেছে, স্বচ্ছন্দে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পার। বড় কুমারকে খবর দিলেই তিনি পালকি পাঠিয়ে দেবেন—"

রঙ্গাবতী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখ দুটো বাঘিনীর চোখের মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল। কিন্তু রঙ্গাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার চোখের ভাষা যাই হোক মুখের ভাষায় যা বেরুল তা উত্তাপহীন। বরং অশ্রুর আভাসই যেন পাওয়া গেল তাতে।

"আমার দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ করুন। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না"—তারপর একটু থেমে বললে,"বিশ্বাস করুন, বড় কুমার নিজেই আমাকে ডেকেছিলেন। তাই—"

তার কথা শেষ করতে দিলে না মহারাণী।

"পুরুষ জাতটাই ওইরকম। ওদের পাগলামি থেকে বাঁচতে হলে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হয় এ বুদ্ধি যে তোমার নেই তা বিশ্বাস হয় না। যাই হোক আমার কাছে যদি থাকতে চাও তাহলে ছাত থেকে নাবতে পাবে না। ওই ছাতের ঘরেই তোমার সব ব্যবস্থা করে নাও। ছাতের বাগান নিয়েই তুমি থাকো। নীচে আর তোমাকে যেন না দেখি—"

পরদিন থেকে রঞ্জাবতী প্রায় বন্দিনী হয়েই রইল ছাতের ঘরে। তার জন্য আলাদা একটি দাসীও নিযুক্ত হ'ল, আপাতদৃষ্টিতে রঞ্জাবতীর ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, কিন্তু তার আসল কাজ হ'ল রঞ্জাবতীর উপর কড়া নজর রাখা।

মহেন্দ্রনাথ এদিকে ক্রমশ বিস্মিত এবং অধীর হয়ে উঠছিলেন। রোজই প্রত্যাশা করছিলেন মহারাণীর ডাক আসবে। কিন্তু এক পক্ষ কেটে গেল কোন খবর পর্যন্ত এল না। বিনা নিমন্ত্রণে আবার যাওয়াটা শোভন হবে কি না, গেলেও কি ওজুহাতে যাবেন এই সবই চিন্তা করছিলেন তিনি, এমন সময় কালেক্টার সাহেবের কাছ থেকে জরুরি এক তলব এল, ছুটতে হ'ল সদরে।

কালেক্টার আরও কয়েকজন জমিদারকেও ডেকেছিলেন। সাহেব বললেন, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন যে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছেন। তাকে ধরতেই হবে যেমন ক'রে হোক। এর জন্যে তিনি ফৌজ আনিয়ে রেখেছেন, খবর পাঠালেই যে কোন জমিদার সে ফৌজের সাহায্য পেতে পারবেন। আর যিনি তাকে ধ'রে দিতে পারবেন তিনি রাজাবাহাদুর খেতাব তো পাবেনই, রাজোচিত সম্মানও পাবেন গভর্নমেন্টের কাছ

থেকে। মহারাণীর প্রতিভূ হিসেবে কিশোরীমোহনও ছিলেন সেখানে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল খবরটা তিনি যেন নির্বিকার ভাবেই শুনছেন। কিন্তু মনে মনে তিনি মোটেই নির্বিকার ছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন রঞ্জাবতী তাঁকে যে খবরটা দিয়েছে এই সুযোগে সেটা কালেক্টার সাহেবের কর্ণগোচর করলে কেমন হয়। সাহেব এখন এই নিয়ে যে রকম ক্ষেপেছে হয়তো টোপটা গিলতেও পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে কথাটা বলাই সাব্যস্ত করলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। একটু কৌশল করতে হ'ল। সব জমিদাররা যখন একে একে বিদায় নিলেন, তখন তাঁদের দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে গেলেন তিনি কিছুদূর। তারপর একটা গ্রামে নিজেদের একটা কাছারিতে ঢুকে পড়লেন। সেখানে বিশ্রাম করলেন একটু। তারপর সন্ধ্যার দিকে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ফিরে গেলেন কালেক্টার সাহেবের বাংলোয়। বাংলোয় পোঁছতে রাতই হয়ে গেল একটু। চাপরাশিকে বখশিস দিতে হ'ল খবরটা দেবার জন্য। বলে পাঠালেন মহারাণী চৌধুরাণীর ম্যানেজার জরুরি দরকারে একবার দেখা করতে চাইছেন। দেখা হ'ল। কিন্তু কিশোরীমোহনের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। অত কথা গুছিয়ে বলবার মতো ইংরেজি জ্ঞান তাঁর ছিল না। তাই কথাটা তিনি সরাসরি কালেক্টার সাহেবের কর্ণগোচর করতে পারলেন না। সাহেব একজন দো-ভাষীকে ডাকলেন। এ সম্ভাবনাটার কথা আগে মনে হয়নি তাঁর। দো-ভাষী রাঘব সিংহের জবানীতেই অবশেষে বক্তব্যটা নিবেদন করতে হ'ল তাঁকে। কালেক্টার সাহেব খবরটা শুনে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে বললেন খবরটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, তবে এদেশে সবই সম্ভব। যাই হোক, কিশোরীমোহন তাঁর সংবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যে যদি গর্ভনমেন্টের সাহায্য চান সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন। ফৌজ চাইলে ফৌজও পাবেন। কিশোরীমোহন সেলাম ক'রে চলে এলেন।

....রাত অনেক হয়েছিল, একা পালকির মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন তিনি। হঠাৎ ধাবমান অশ্বের পদশব্দে চমকে উঠলেন। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে মাঠ ভেঙে ছুটে চলেছে। প্রকাণ্ড পাগড়ী, এছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না।

অশ্বারোহীর নাম রাঘব সিংহ।

পালকি-সারানো ব্যাপার নিয়ে মহারাণী মেতেছিল, তার অন্য কারণ যাই থাক একটা কারণ সে নিজেকে ভুলে থাকতে চাইছিল। মহেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ বাহুপাশে সেদিন রঞ্জাবতীকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত মন বিকল হয়ে গিয়েছিল যেন। অহেতুকভাবে তার কেবলি মনে হচ্ছিল মহেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এটা সে সুনিশ্চিত ভাবেই জানত যে মহেন্দ্রনাথকে সে কখনও বিয়ে করবে না, লম্পটের লালসার খোরাক হবার প্রবৃত্তি নেই তার কোনকালে। কিন্তু তবু মনে মনে সে মহেন্দ্রনাথকে নিজের সম্পত্তি ব'লে গণ্য ক'রে রেখেছিল। মহেন্দ্রনাথ যে তারই কৃপাকণা আহরণ করবার জন্যে ভিক্ষুকের মতো দিনের পর দিন হাত পেতে বসে আছে এই ধারণাটাকে সে মনে মনে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছিল, উপভোগও করছিল। শ্রীহর্ষকেই সে ভালোবেসেছিল, কিন্তু পায়নি তাকে, সে দুর্লভ ব'লে তাকে পাবার চেষ্টাও করেনি, নাগালের মধ্যে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ সে বুঝেছিল যে যেমন ক'রে তাকে পেতে চায় তেমন ক'রে তাকে পাওয়া যাবে না, তার অহঙ্কৃত কামনার অনলে সে নিজের সমগ্র সত্তাকে ইন্ধনরূপে সমর্পণ করতে পারবে না, কারণ সে আত্মসম্মানী, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দু'দিনের জন্যে উতলা হয়েছিল বটে, কিন্তু দু'দিনেই মোহ কেটে যেত তার। আর তারপর লাঞ্ছিত অর্ধ-দগ্ধ মহত্ত্বের আর্তনাদে বিষময় হয়ে উঠত সব। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ওর মতো দুর্লভ নন, বরং

ঠিক উলটো। মহেন্দ্রনাথ ভোগী, কামনার খর-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই, এতটুকু দ্বিধা নেই, পড়েছেনও একাধিকবার, আবার পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। মহারাণী তাঁকে প্রশ্রয় করে না, কিন্তু তবু তিনি যে তাকে ত্যাগ ক'রে আর একজনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এ-ও সে সহ্য করতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল—আমি সারাজীবন বঞ্চিতই থেকে গেলাম। যেমন ক'রে চেয়েছিলাম তেমন ক'রে কাউকেই পেলাম না। শ্রীহর্ষ অতি-পবিত্র, মহেন্দ্রনাথ উচ্ছিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে আমার কেউ হল না। একটা যৌন হাহাকারে ভ'রে উঠেছিল তার বুক। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মহারাজ। তার কাছেই যাচ্ছিল বারবার। তার পিঠে চড়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা একা, তাকে অজস্র আদর ক'রে, সম্পূর্ণরূপে পদানত ক'রে তার বলিষ্ঠ সিংহ-মহিমাকে পরিণত করবার চেষ্টা করছিল মেষ-সুলভ বশ্যতায়। সে চেষ্টাও সফল হচ্ছিল না সব সময়।

হঠাৎ সে সর্বমঙ্গলার কাছে গেল আবার। কেন গেল তা বলা শক্ত। যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। সর্বমঙ্গলা কত সুখে আছে তাই দেখবার জন্য হয়তো গেল। যে ক্ষুধিত সে অপরকে খেতে দেখলে তির্যকভাবে যে তৃপ্তিলাভ করে সেই তৃপ্তি লাভ করবার জন্যেই গেল হয়তো। কিম্বা হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর আহরণ করবার জন্যে গেল—আমি যাকে আয়ত্তাতীত মনে করেছিলাম সর্বমঙ্গলা কি তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছে? হিমালয় কি হস্তামলক হয়েছে তার?

মাদ্রাজিনী-মাহুত-চালিত হস্তী শ্রীহর্ষের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন থামল তখন সর্বমঙ্গলা রান্নাঘরে ছিল। হাতীর ঘণ্টার শব্দে সে তাড়াতাড়ি জানলা খুলে দেখতে গেল কে এসেছে। জানলাটা কিন্তু এত এঁটে গিয়েছিল, খুলতে পারলে না সে। সামান্য একটু ফাঁক হ'ল, তাই দিয়ে যা সে দেখতে পেলে তাতে শিউরে উঠল।

তার মনে হ'ল যেন প্রকাণ্ড একটা কালো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। হাতীর বাঁকানো শুঁড়টাই শুধু চোখে পড়েছিল তার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরকন্দাজের সাড়া পাওয়া গেল বাইরের দরজায়।

"রাণীমা এসেছেন—"

সর্বমঙ্গলা তাড়াতাড়ি একটা গামছা দিয়ে হাতটা মুছতে লাগল। হাতে মশলা লেগেছিল। মহারাণীর গলার স্বর শোনা গেল তারপর।

"কি গো, তোমাদের সব খবর কি।"

সর্বমঙ্গলা হাসিমুখে বললে, "আসুন। উনি কিন্তু বাড়ি নেই।"

"আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার খবর নিতেই এলুম। আমার কথা তো ভুলেও মনে কর না একবারও।"

কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সর্বমঙ্গলা।

"খবর সব ভালো তো?"

"ভালই।"

"কি করছিলে?"

"রান্নাঘরে ছিলাম।"

"রান্নায় বাধা দিলাম না কি। তাহলে তো ব্রাহ্মণের খাওয়া হবে না।"

"রান্না হয়ে গেছে। পোস্তটা চড়িয়ে এসেছি, হয়ে গেছে, নাবিয়ে আসি—"

"চল দেখি কি কি রান্না করেছ।"

অকৃত্রিম কৌতূহল ভরে সর্বমঙ্গলার পিছু পিছু গেল মহারাণী। সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সে।

...পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটি। অনেক তরকারি করেছে সর্বমঙ্গলা। শাকভাজা, উচ্ছে ভাজা, সুকতো, মোচার ঘণ্ট, পোস্ত, ডাল। তাছাড়া বাসী মাছের টকও আছে।

"ভাত রান্না করনি?"

"উনি এলে চড়িয়ে দেব। ঠাণ্ডা ভাত ভালবাসেন না উনি। কখন যে ফিরবেন, ফিরবেন কিনা তারও তো ঠিক নেই।"

"কোথা গেছে শ্রীহর্ষ ?"

"রহিমগঞ্জে।"

"সেখানে কেন ?"

"আমার দূর সম্পর্কের এক ননদ মারা গেছে।"

"তাই না কি! কি হয়েছিল ?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে।"

"সে কি! কেন ?"

"স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সর্বমঙ্গলা পোস্তটা নাবিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলে। তারপর হাত ধুয়ে বললে, "চলুন, ওঘরে যাই—"

এই শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদটা ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল মহারাণীর মনে। এর আগে অনেক মৃত্যুর সংবাদ শুনেছে সে। মৃত্যুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে তার। বাবার মৃত্যুই স্বচক্ষে দেখেছে সে। সেই কথাই মনে পড়ল আবার। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে সমুদ্রবিলাসের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল, চোগের মণি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, মরবার আগে সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন পৃথিবীকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছিলেন। কোন ওষুধ খাননি, গঙ্গাজলও না, কেবল মদ, মদ আর মদ। বিশেষ কোনও কথাও বলতেন না, নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন কেবল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে একবার "এই হো—" বলে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, চাকর, বাকররা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তাদের কোন হুকুম দেননি আর। দীনা বাইজি কাছে বসেছিল, তাকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন গান গাইতে। দীনা বাইজি বেহাগ আলাপ করতে লাগল, বেহাগ শুনতে-শুনতেই মৃত্যু হ'ল তাঁর।...শান্ত পিসির

মৃত্যুও দেখেছিল মহারাণী। শান্ত পিসী কেমন যেন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেলেন। জীবনের শিখা একটু একটু ক'রে কমতে কমতে ধীরে ধীরে নিবে গেল।···আজকের এই মৃত্যু-সংবাদটা একটা বিশেষ রূপে যেন অভিভূত করল তাকে। শোক নয়, দুঃখ নয়, শ্রীহর্ষের দূর-সম্পর্কের যে বোন ছিল তা সে জানতও না, কিন্তু স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে যে অভাগিনী গলায় দড়ি দিয়ে প্রতিবাদ ক'রে গেল, তার অশরীরী অদেখা চেহারাটা যেন ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার মনে।

শোবার ঘরে এসে তাই সর্বমঙ্গলাকে যা সে বলল তাতে সর্বমঙ্গলা অবাক হয়ে গেল একটু।

"নমস্য লোক তোমার ওই ননদ।"

"আপনি চিনতেন না কি তাঁকে?"

"না। অমানুষ স্বামীর সঙ্গ এমনভাবে ত্যাগ করতে পেরেছে বলেই নমস্য বলছি তাকে। মরবে তো সবাই একদিন, কিন্তু নিজের মান বাঁচাবার জন্যে যে মরতে পারে সেই তো নমস্য। পদ্মিনীর কথা শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"ওরা সব একজাতের। আহা, আমিও যদি অমন ভাবে মরবার সুযোগ পাই—"

কথাটা শুনে অবাক হ'ল সর্বমঙ্গলা। মহারাণীর সম্বন্ধে তার যে ধারণা এতদিন ছিল সেটা হঠাৎ যেন বদলে গেল।

মহারাণী আবার বলল, "কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব জিনিস হয় না। ভাগ্য থাকা চাই।"

সর্বমঙ্গলা উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখে যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে, তা বোধহয় সে নিজে জানতে পারেনি। মহারাণী কিন্তু লক্ষ্য করেছিল, সে উজ্জ্বল দৃষ্টির দীপ্তি অনেকদিন আলোকিত ক'রে রেখেছিল তার মনকে।

এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল অন্য কথায়।

মহারাণী জিগ্যেস করল, "তোমাদের পাতাল-ঘর কেমন হ'ল ?"

"ভালই। চলুন না দেখবেন।"

"চল।"

যেদিন মহারাণী রূপোর পালকিতে চ'ড়ে সর্বমঙ্গলাকে গয়না পরাতে এসেছিল সেইদিনই সূচনা হয়েছিল এই পাতাল-ঘরের। শ্রীহর্ষ বলেছিল, "তুমি ক্রমাগত এত দামী দামী গয়না কাপড় দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আমি এসব রাখব কোথা। আমাদের তো ওই দুটি প্যাঁটরা মাত্র সম্বল। চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে যে—"। মহারাণী বলেছিল, "সে ব্যবস্থাও হবে।" তার পরদিনই মিস্ত্রি এসেছিল মাটির নীচে মজবুত পাকা পাতাল-ঘর নির্মাণ করবার জন্য। একটা ঘরের মেজে খুঁড়ে ভূগর্ভে নির্মিত হয়েছিল ঘরটি। অথচ বাইরের থেকে বোঝবার উপায় ছিল না, মেজের নীচে অতবড় একটা ঘর রয়েছে। পাতাল-ঘরে নেবে মহারাণী চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

"বেশ হয়েছে ঘরটি। পছন্দ হয়েছে তো ?"

"আপনি যখন করিয়ে দিয়েছেন তখন অপছন্দ হবার কি আছে ? ঘর ভালই হয়েছে। তবে—"

থেমে গেল সর্বমঙ্গলা।

"তবে আবার কি ?"

"এই ঘরটায় নাবলেই কেমন যেন গা ছমছম করে আমার। মনে হয় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে এর ভিতরে।"

"তার মানে ভীতুর শিরোমণি তুমি! চল, ওপরে যাই—"

সেদিন অনেকক্ষণ ছিল মহারাণী সর্বমঙ্গলার কাছে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল তার। যা সে জানতে গিয়েছিল তা জেনেই ফিরেছিল। শ্রীহর্ষকে পেয়ে সর্বমঙ্গলা সুখী হয়নি। শ্রীহর্ষকে বুঝতে পারেনি

সে ঠিক। কাছে পেয়েও যেন পায়নি, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ ভয়ের কারণটা যে কি তা-ও জানে না। এমন দিনও না কি গেছে যে শ্রীহর্ষ সমস্তদিন একটি কথাও বলেনি তার সঙ্গে, পুঁথি নিয়ে ছাত্রদের নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলে না। রাত্রে কখন যে শুতে আসে সর্বমঙ্গলা টের পায়না সব সময়ে। আলাদা বিছানায় শোয় শ্রীহর্ষ। বলে, একসঙ্গে শুলে তার না কি ঘুম হয় না। খাওয়ার সময়ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, সামনে যা দেওয়া যায় তাই খেয়ে নেয়। রান্না ভালো হ'লে প্রশংসাও করে না, খারাপ হ'লে বকাবকিও করে না।...ফেরবার সময় হাওদার উপর মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আকাশের শুভ্র মেঘ-স্তূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মহারাণী ভাবছিল—শ্রীহর্ষকে পাওয়া অত সোজা নয়। আমি ওকে চিনেছিলাম বলেই ছেড়ে দিয়েছি। ও মহাদেব, অনেক তপস্যা করলে তবে ওকে পাওয়া যায়। অত তপস্যা আমার পোষাবে না বলেই ছেড়ে দিয়েছি ওকে। আমার স্বামী আমাকে পাবার জন্যেই তপস্যা করবে। আমি তপস্যা করব কেন! কিন্তু কোথায় সে? কোথাও সে আছে কি? আকাশের পটে শ্রীহর্ষের মুখখানাই ফুটে উঠল ধীরে ধীরে। তারপর তার সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল—সর্বমঙ্গলা তাহলে পায়নি। মন্দির প্রদক্ষিণই করছে কেবল, মন্দিরে ঢোকবার দ্বার খুঁজে পায়নি এখনও। হঠাৎ তার মনে হ'ল, আমিও কি পেয়েছি? কখনও কি পাব? ও মন্দিরের কোন দ্বার আছে কি?

মহেন্দ্রনাথ শেষে বিনা-নিমন্ত্রণেই এলেন একদিন। তাঁর ধৈর্য সীমা অতিক্রম করেছিল। নানাসাহেবের ওজুহাত নিয়েই এলেন। ওজুহাতটা অবশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিকও ছিল না। প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে বৃটিশ ফৌজ রহড়া গ্রাম ঘেরাও করেছিল নানাসাহেব সে গ্রামে আছেন এই সন্দেহ ক'রে। একজন শৈব সন্ন্যাসীকে ধরেও

নিয়ে গিয়েছিল তারা, তার উপর অত্যাচারও করেছে যথেষ্ট। রহড়ার জমিদার কুলেশ বাঁড়ুয্যে নিজে জামিন হয়ে শেষে তাকে উদ্ধার করেছেন। এ সব খবর মহারাণীকে বলবার মতো বইকি।

শৌরসেনী যথারীতি মহেন্দ্রনাথকে গোল-বৈঠকে নিয়ে গেল। পানের ডিবে, আতরদান প্রভৃতি সামনে সাজিয়ে দিয়ে নম্র মৃদু কণ্ঠে বলল, "রাণীমা এসেছেন, আপনি কথা বলুন—"

বলা বাহুল্য, এবার ঠিক এ ধরণের অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেননি মহেন্দ্রনাথ। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর এক খিলি পান বার করলেন ডিবে থেকে, শূন্যে সেটা ধরে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর কি ভেবে আবার রেখে দিলেন সেটা। গোঁফে তা দিলেন একবার, তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললেন, "নানাসাহেব যে এ অঞ্চলে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রহড়ায় গভর্নমেণ্টের ফৌজ গিয়েছিল। তোমাকে তাই সাবধান ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করলাম।"

মহেন্দ্রনাথ এতদিন 'আপনি' বলে এসেছেন, কিন্তু সেদিনের ঘটনা স্মরণ ক'রে 'তুমি' বলাই সমীচীন মনে করলেন।

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আপনিই তো আমার একমাত্র ভরসা। যেমন বলবেন, তেমনি করব।"

"তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। সেদিন পরদা সরে গিয়েছিল আজ আবার পরদা কেন?"

মহারাণীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল পরদার ওপারে।

"তবে সেদিন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলাম না কি?"

"না। আমার ছাত-বাগানের মালিনী রঞ্জাবতীকে দেখেছিলেন। সে আপনার অনুগ্রহ লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে গেছে"—তারপর একটু থেমে বলল, "তাকে ডেকে পাঠাব কি?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে রইলেন।

তারপর ক্রোধে আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল তাঁর। দেখতে দেখতে সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। মহারাণীর যেমন মনে হয়েছিল তাঁরও তেমনি মনে হ'ল, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমার সঙ্গে এরকম চাতুরী করবার অর্থ কি বুঝতে পারছি না।"

"ভগবান সাক্ষী, আমি কোনও চাতুরী করিনি। রঞ্জাবতী পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল, তারপর আপনি না কি তাকে ডেকেছিলেন। আপনার আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে, কারণ আপনি আমার সম্মানিত অতিথি আর সে পরিচারিকা মাত্র। আমি তখন এখানে ছিলামও না, ছিলাম খিড়কি বাগানে। এসে দেখলাম আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করছেন। তখন আপনাকে বাধা দেওয়া রুচিবিরুদ্ধ মনে হয়েছিল আমার—"

মহেন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

মহারাণী বলল, "আপনি যদি আদেশ করেন, রঞ্জাবতীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। মনে হয় সে-ও আপনার সঙ্গ লাভ করবার জন্যে উৎসুক।"

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের। আরও কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর সহসা তাঁর চোখের কোণে হাসির দীপ্তি ফুটে উঠল, সুস্থ রস-বোধ জাগ্রত হ'ল মনে, ক্রোধের মেঘ হঠাৎ কেটে গেল। মৃদু হেসে উপমার সাহায্যে উত্তর দিলেন তিনি।

"মণিভ্রমে কাচে হাত দিতে গিয়েছিলাম। ভুলটা যখন ভেঙে গেল তখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। আসল হীরাকেই শিরোভূষণ করব, যদি অবশ্য পাই। দেবীর জন্যেই পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখেছি। তোমাকেই চাই আমি।"

"আমাকে যদি দেবীর মর্যাদাই দিলেন তাহলে উচ্ছিষ্ট ভোগ

নিবেদন করছেন কেন ? আমি দেবী নই, সামান্য মানবী, আমারও উচ্ছিষ্টে রুচি নেই।”

আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। আবার তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ধক্ ধক্ ক’রে আগুন জ্বলে উঠল।

“একটা কথা তোমাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি মহারাণী। আমি যদি এই মুহূর্তে উঠে পরদা সরিয়ে জোর ক’রে তোমাকে দখল করি কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।”

“মহারাজ জবাব দাও এ কথার—”

বজ্রগর্জনে সমস্ত গোল-বৈঠকটা থর থর ক’রে কেঁপে উঠল। মহেন্দ্রনাথের হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু নিজের অভব্য উক্তির জন্য পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

বললেন, “সিংহকে ভয় করি না। কিন্তু নিজের এই আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জিত হয়েছি। ক্ষমা চাইছি—”

পরদার ওপার থেকে কোন জবাব এল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক’রে মহেন্দ্রনাথ উঠে গেলেন। সিঁড়ির নীচে সম্বৃতবাসা শৌরসেনী নত-নেত্রে দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে অন্দরমহলের সীমানা পার ক’রে দিয়ে ফিরে এল।

সেদিন এ ঘটনাটা যদি না ঘটত তাহলে পরবর্তী ঘটনাগুলোর চেহারা বদলে যেত হয়তো। হয়তো মহারাণী মহেন্দ্রনাথের সাহায্য চাইত, হয়তো মহেন্দ্রনাথের লাঠি শড়কি বন্দুকধারী বরকন্দাজের দল রৈ রৈ করে ছুটে আসত তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু এ ঘটনার পর তা আর সম্ভবপর হ’ল না।

এর পরদিনই যে ঘটনাটি ঘটল তা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার ফল যা হ’ল তাতে ওলট-পালট হয়ে গেল সব। পরদিন বাইরের মহলে বহুরূপী এল একজন, ফুলের গয়না প’রে, সুন্দর একটি ফুলের সাজি নিয়ে, মালিনী সেজে। নেচে গেয়ে এমন জমিয়ে ফেললে সে যে ভীড় জমে গেল। সেরেস্তার বুড়ো

বুড়ো কর্মচারীরাও কানে-কলম-গোঁজা অবস্থায় বেরিয়ে এসে তার নাচ দেখতে লাগল। নাচ যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালিনী নায়েব মশায়ের কাছে নিবেদন জানাল সে অন্দরে গিয়ে রাণীমাকেও নাচ দেখাতে চায়।

নায়েব মশাই গোঁফ চুলকে বললেন, "সেদিন আর নেই হে যে হুট বলতেই অন্দরে ঢুকে পড়বে। আজকাল পুরুষ চাকর পর্যন্ত বিনা হুকুমে অন্দরে ঢুকতে পায় না। খুব কড়াক্কড়ি আজকাল।"

"হুজুর চেষ্টা করলে হুকুম নিশ্চয় পাব। হুজুরের কথায় কি 'না' বলবেন রাণীমা—"

তোষামোদে তুষ্ট হয়ে নায়েব মশাই হুকুম করলেন, "তেওয়ারি, অন্দরের ঘণ্টার দড়িটা টেনে দাও তো। কেউ এলে বলে দাও একজন বহুরূপী রাণীমাকে নাচ-গান দেখাতে চায়—"। ঘণ্টার শব্দে শৌরসেনীই বেরিয়ে এসেছিল কপাট খুলে। বহুরূপীর কথা শুনে সে-ও উৎসাহিত হ'ল খুব। একটু পরেই খবর এল মহারাণী বহুরূপীকে অন্দরে যেতে হুকুম দিয়েছেন। অন্দরেও বহুরূপী জমিয়ে ফেললে খুব। গানের গলাও তার যেমন মধুর, নাচও তেমনি সুন্দর। তার বিদ্যাসুন্দরের গান আর পদাবলী-কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। মহারাণী দ্বিতলের অলিন্দে চিকের আড়ালে বসে ছিল। তারও খুব ভাল লাগল, বিশেষ ক'রে পদাবলী কীর্তনগুলি। গান শেষ হয়ে গেলে শৌরসেনীর হাতে দু'টি মোহর দিয়ে সে বলল, "চমৎকার গেয়েছে। দিয়ে আয় ওকে—"

শৌরসেনী নেবে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে যা বলল তা প্রত্যাশা করেনি মহারাণী।

"বহুরূপী আপনাকে প্রণাম করতে চাইছে। নিয়ে আসব এখানে?"

"নিয়ে আয়।"

বহুরূপী এসে ভক্তিভরে প্রণাম করল মহারাণীকে। তারপর সসঙ্কোচে বলল, "এই ফুলগুলি আমি তৈরি ক'রে এনেছি আপনার চরণে উপহার দেব ব'লে।"

সাজিটি মহারাণীর পায়ের কাছে রেখে হাত জোর ক'রে বসে রইল সে।

সাজিতে শোলার তৈরি নানান রকম সুদৃশ্য ফুল ছিল, একটি পদ্ম কলিও ছিল।

"তুমি তৈরি করেছ? বাঃ চমৎকার তো, ভারী খুশী হলাম তোমাকে দেখে। বাড়ি কোথা তোমার?"

"ডিহি দরিয়াপুর—"

ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল মহারাণীর। নামটা যেন শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনে পড়ল না তখন।

বহুরূপী প্রণাম ক'রে চলে গেল। ফুলের সাজিটা দালানের এককোণেই প'ড়ে রইল অনেকক্ষণ। মহারাণী শিব-মন্দিরের কাজ সেরে যখন ফিরে এল তখন শৌরসেনী বলল, "ফুলগুলো কি আপনার ঘরে দিয়ে আসব, না গোল-বৈঠকে সাজিয়ে দেব।"

"আমার ঘরেই দিয়ে আয়। পুতুলের আলমারিতে রেখে দেব। বেশ করেছে ফুলগুলি—"

মহারাণীর পুতুলের আলমারিতে হাত দেবার দেবার হুকুম ছিল না কারও। ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি সাজানো ছিল ওই আলমারিটির মধ্যে। মহারাণী নিজেই খুলত সেটি মাঝে মাঝে। শৌরসেনী মহারাণীর ঘরে সাজিটি রেখে এল। খানিকক্ষণ পরে মহারাণী সাজিটি আলমারিতে রাখতে গিয়ে দেখল সাজিটি আলমারির তাকে আঁটছে না, ফুলগুলি আলাদা আলাদা ক'রে রাখতে হবে। তাই করতে গিয়ে ফুলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল সাপ। ফুলের তলায় পানের ডিবের মতো রূপোর কৌটো ছিল একটি। তার ভিতর ছিল এই চিঠিখানি।

"মহারাণী, আশা করি আমার কথা মনে আছে। আমি ব'লে এসেছিলাম আমার দাবী নিয়ে আবার আমি আসব। এবার হতাশ হয়ে ফেরবার ইচ্ছে নেই, সঙ্গে চতুর্দোলা, পুরোহিত নিয়েই যাব। শতাধিক সশস্ত্র লোকও থাকবে সঙ্গে। আগামী অমাবস্যা রাত্রে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—উদয়প্রতাপ"

অন্য মেয়ে হ'লে হৈ চৈ ক'রে উঠত। কিন্তু মহারাণী নীরব হয়ে গেল। ভাবতে লাগল কি করা উচিত। মহেন্দ্রনাথের যে আচরণ কাল প্রকট হয়ে পড়েছে তারপর আর তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা যায় না। তার নিজের বাইরের মহলে যে ক'টি বরকন্দাজ আছে তারা শতাধিক সশস্ত্র লোককে রুখতে পারবে না, যদি চেষ্টা করে তাহলে অনর্থক রক্তারক্তি হবে, লাভ হবে না কোনও। শেষ পর্যন্ত ওদের হারিয়ে দিয়ে প্রতাপ জোর ক'রে অন্দরমহলে ঢুকবে, বলাৎকার করতেও দ্বিধা করবে না। ডিহি-দরিয়াপুরের যে দাসীটি তখন অন্দরমহলে চুল-বাঁধুনী হয়েছিল সে নিম্নকণ্ঠে উদয়প্রতাপের যে পরিচয় দিয়েছিল তা ভয়ানক। তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে উদয়প্রতাপ হীনতম উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হবে না, জোর করেই তাকে চতুর্দোলায় টেনে তুলবে। ডিহি দরিয়াপুরের চাকরানীটি বলেছিল ও ডাকাতের সর্দার একজন। ডাকাতি করেই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, ওর দলের লোক সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, যখন যেখানে খুশী। ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। নিজের সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না সে। কিছুদিন আগে চাকরানীটি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, এখনও ফেরেনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মহারাণী ভাবতে লাগল কি করলে সব দিক রক্ষা হয়। অনেক ভেবে অবশেষে সে ঠিক করলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিশোরীকাকা যদি নিজে

গিয়ে খবরটা কালেক্‌টার সাহেবকে ব'লে আসেন তাহলে তিনি কি মহারাণীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা করবেন না?

আর চারদিন পরে অমাবস্যা! হাতে বেশী সময় নেই।...মহারাণী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইল খানিকক্ষণ, তারপর কিশোরীকাকার খোঁজে পাঠাল শৌরসেনীকে।

শৌরসেনী ফিরে এসে বলল, তিনি খাজনা আদায় করবার জন্যে মহালে মহালে ঘুরছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই এমন আর একটি ঘটনা ঘটল যে কালেক্‌টার সাহেবকে খবর দেওয়ার কল্পনা বিসর্জন দিতে হ'ল।

সেদিন কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদ উঠল অনেক রাত্রে।

মহারাণী বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল, কিছুতে ঘুম আসছিল না। ঠিক ভয়ে নয়, অস্বস্তিতে। আর একটা অদ্ভুত জিনিসও হচ্ছিল তার, শ্রীহর্ষকে মনে পড়ছিল। সর্বক্ষণ সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল সে। খবরটা পাওয়ার পর থেকে তার মন শ্রীহর্ষকে যেন আঁকড়ে ধরছিল। অথচ শ্রীহর্ষ এ ব্যাপারে কি-ই বা করতে পারে? এ খবর তাকে দেওয়াও বৃথা। দিলে হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠবে (সত্যি হবে কি, মহারাণীর একবার মনে হ'ল), হয়তো বলবে তুমি আমার বাড়িতে এসে থাক, হয়তো গ্রামের লোকদের এনে জড়ো করবে, হয়তো নিজেই চ'লে যাবে কালেক্‌টার সাহেবের কাছে। খবরটা পেলে শ্রীহর্ষ যে কত কি করবে এই কল্পনাই তার মনে প্রসারিত হচ্ছিল মেঘের মতো। এমন সময় খিড়কির বাগানে মহারাজের গর্জন শোনা গেল। একবার নয়, দু'বার। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল মহারাণী। মহারাজ এ সময়ে ডাকছে কেন? অযৌক্তিকভাবে একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তার। মহারাজ কি টের পেয়েছে আমি শ্রীহর্ষের কথা ভাবছি? হিংসে হ'ল না কি ওর। আর একবার গর্জন শোনা গেল।

মহারাণী নেমে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর কপাট খুলে বেরি গেল। দালানের অপরপ্রান্তে শৌরসেনীর ঘর। তার ঘরে বদ্ধদ্বারের দিকে চেয়ে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঘুম ভেঙ্গেছে কি? তার কোন লক্ষণ না দেখে একাই সন্তর্পণে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, চলে গেল খিড়কির বাগানে। খিড়কির বাগানে ঢুকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। এ কোথায় এল সে। এই কি তার খিড়কির বাগান? এ যে মনে হচ্ছে অচেনা এক নূতন জগৎ! এ খিড়কির বাগান সে কোনদিন দেখেনি তো। গভীর রাত্রি থতমত করছে চতুর্দিকে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে শিবমন্দিরের পিছনে, মন্দিরটাই মনে হচ্ছে যেন ধ্যানমগ্ন শিব। শিবের তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে চাঁদ যেন ললাট ছেড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নাগলিঙ্গম্ গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের ঝোপগুলো মনে হচ্ছে যেন পুঞ্জীভূত গোপন কথা, জ্যোৎস্নার কাছ থেকে কি যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে, জ্যোৎস্না কিন্তু লক্ষ্যও করছে না এসব, আকাশের ধ্যানেই সে নিমগ্ন, তার অজ্ঞাতসারেই তার মহিমা যেন ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে, সে এখনও আসেনি।

মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। এ কি নূতন সাজে সেজেছে তার খিড়কির বাগান। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সে মহারাজের মহলের দিকে। গিয়ে দেখল মহারাজের দৃষ্টি শিব-মন্দিরে নিবদ্ধ। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে।

"মহারাজ, কি হয়েছে?"

মহারাজ একলম্ফে চলে এলো মহারাণীর কাছে। মহারাণী যে এমন সময়ে আসবে তা প্রত্যাশাই করেনি সে। মহারাণী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই তার স্বাভাবিক রীতিতে গরগর শব্দ ক'রে সে আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে পিঠ পেতে দিল—ভাবটা উঠবে পিঠে? ওঠ না।

মৃদু হেসে মহারাণী পিঠে চড়ল। তার মনে হ'ল আজকের রাত্রির এই অদ্ভুত মায়া মহারাজকেও যেন বদলে দিয়েছে। একটু যেন বেশী ভদ্র হয়েছে ও আজ। মহারাজের পিঠে চ'ড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কিছুক্ষণের জন্য সে উদয়প্রতাপের সাংঘাতিক চিঠির কথাও ভুলে গেল। তার কল্পনাও যেন পাখা মেলে উড়তে লাগল। মনে হ'ল শ্রীহর্ষের অশরীরী প্রেম যেন আজ ভর করেছে মহারাজের উপর। মহারাজের মাধ্যমেই শ্রীহর্ষ যেন সানন্দে বহন করছে তাকে। কল্পনা করতে লাগল শ্রীহর্ষ ঘুমুচ্ছে, সর্বমঙ্গলার কাছে নয়, আলাদা খাটে। স্বপ্ন দেখছে কি? হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেল কষ্টি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কষ্টিও জেগে আছে না কি এত রাত্রে? কি বলছে ও। মহারাজের পিঠ থেকে নেমে মহারাণী পশুমহল থেকে বেরিয়ে এল। কষ্টি আসছে না কেন? আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। মহারাণী এগিয়ে গেল, গিয়ে দেখল কষ্টি কাঁপছে।

"কি বলছিস?"

কষ্টি কিছু বললে না, আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখিয়ে দিলে কেবল।

"কি হয়েছে ওখানে?"

কষ্টির চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে গেল, মনে হ'ল যেন জীবন্ত চোখ নয়, মনে হ'ল শাদা পাথরের উপর থেকে কালো পরদা স'রে যাচ্ছে যেন। আবার সে আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখাল।

কি হয়েছে মন্দিরে? মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেল মহারাণী। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল, কিছু দেখতে পেল না। আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল কপাটের শিকলটা খোলা রয়েছে। নিজের হাতে রোজ সে শিকল তুলে দিয়ে যায়, আজ কি ভুলে গেছে? এরকম ভুল তো আর কোনদিন হয় না। কপাট খুলে ভিতরে ঢুকেও প্রথমে সে কিছু দেখতে পায়নি। আবছা জ্যোৎস্নায়

শিবলিঙ্গটা দেখা গেল প্রথমে। তারপরই চমকে উঠল সে। শিবলিঙ্গের পিছনে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কে ?"

গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর এল, "নানাসাহেব—"

নানাসাহেব! স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল সে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রত্যাশা করছিল নানাসাহেব আসবেন। এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত মহেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাঁকে। যদি আসেন তাহলে সে কি করবে তা-ও ভেবে রেখেছিল সে। তাই সুবল মিস্ত্রিকে দিয়ে পালকিগুলো মেরামত করিয়ে রেখেছে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে নানাসাহেব যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, বৃটিশ পুলিশের তাড়ায় তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, শিকারীর তাড়ায় বন্য ব্যাঘ্র যেমন পালিয়ে বেড়ায় বন থেকে বনান্তরে। আজ নিরুপায় হয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এই শিবমন্দিরে। তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে বলে গেছে আগামী অমাবস্যা রাত্রে বধূসরা নদীতে সে একটি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করবে তাঁর জন্যে। নৌকোতে চড়তে পারলে মাঝির ছদ্মবেশে তিনি সহজে পালিয়ে যেতে পারবেন। সেই নৌকোটির জন্য অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হবে এই অঞ্চলে। মা কি তাঁর সন্তানকে আশ্রয় দেবেন ? যদি না দেন তাহলে এখনি তাঁকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কয়েক-দিন আগে একজনের অন্দরমহলেই তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাই সাহস ক'রে এখানে ঢুকেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশী নির্ভরযোগ্য। মায়েরাই তো চিরকাল সন্তানদের রক্ষা ক'রে এসেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম হবে এ আশঙ্কা তাঁর নেই। এক মা যদি অসুবিধা বোধ করেন, আর এক মা দেবেন।

মহারাণী নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নানাসাহেবও চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"আমি কি আশ্রয় পাব না? যদি আপনার অসুবিধা হয় আমি এখনই চলে যাচ্ছি—"

"না, আপনি থাকুন। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব আপনাকে।"

নানাসাহেব হাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন এবং তারপর প্রণাম করলেন মহারাণীকে। তারপর উদ্ভাসিত মুখে বললেন, "এমন আশ্বাস মা ছাড়া আর কে দিতে পারে। কপাটের ফাঁক দিয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি আমি। আপনাকে দেখে প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন? মনে হয়েছিল আপনি বুঝি লছমীবাই, তার যে মৃত্যু সংবাদটা শুনেছি সেটা মিথ্যে। তারপর যখন আপনি কাছাকাছি এলেন, যখন আপনাকে সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে দেখলাম তখন আমার ভুল ভাঙল। বুঝলাম আপনি লছমীবাই নন, আপনি আরও অনেক বড়, আপনি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্ভয় হয়ে গেলাম। মনে হ'ল যে মন্দিরে আজ আশ্রয় পেয়েছি সে মন্দিরের শঙ্কর নিষ্প্রাণ পাথর নন, জাগ্রত দেবতা, তাই তাঁর শক্তি জগদ্ধাত্রীকে আজ জীবন্ত দেখলাম। আমার আর কোন ভয় নেই—"

এই নাটকীয় ব্যাপারে মহারাণী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু।

সসঙ্কোচে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই। সামান্য মেয়ে আমি, আপনারই দেশের মেয়ে, এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার আর কিছু নেই। আপনি এই মন্দিরে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।"

তারপর মহারাণী যা করল তা সে জীবনে কখনও করেনি। নানাসাহেবের জন্য নিজেই সে বিছানা বয়ে নিয়ে এল, জলও নিয়ে এল একটা রূপোর ভৃঙ্গারে। নানাসাহেবের কথা কাউকে

সে জানতে দেবে না, নিজেই তার সেবা করবে। মন্দির-সংলগ্ন ছোট যে ঘরটি ছিল তাতেই তাঁর থাকবার জন্য ব্যবস্থা ক'রে দিল সে। এমন কি কাপড় চোপড়ও দিয়ে গেল কিছু।

"আপনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম করুন। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ আসবে না।"

কষ্টি দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সব। মহারাণী জানত দেখলেও বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওর নেই। বাইরে ও যায়ও না। তবু মহারাণী তাকে বলে গেল, "ওদিকে যাসনি। উনি আমার আপনার লোক—"

কিছুক্ষণ পরে নানাসাহেবের সমস্ত ক'রে দিয়ে মহারাণী যখন নিজের ঘরে ফিরল তখনও নানাসাহেবের এই কথাগুলো তার কানে বাজছিল—"যে মন্দিরে আজ আশ্রয় পেয়েছি সে মন্দিরের শঙ্কর নিষ্প্রাণ পাথর নন জাগ্রত দেবতা। তাই তাঁর শক্তি জগদ্ধাত্রীকেও আজ জীবন্ত দেখলাম!" সত্যিই কি তাকে জগদ্ধাত্রীর মতো দেখাচ্ছিল? আশ্চর্য তো। এই কথাটাই মনের মধ্যে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতে লাগল নানা ভাবে। তারপর মনে হ'ল উদয়-প্রতাপের কথা। নানাসাহেব যখন এসেছেন তখন তো কালেক্টার সাহেবকে আর খবর দেওয়া যায় না। ডাকাতের সর্দারের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে না কি শেষ পর্যন্ত?

না, তা অসম্ভব।

পায় একটা বার করতেই হবে।



তার পরদিন সদর নায়েবের ডাক পড়ল মহারাণীর দরবারে।

"কি বলছেন মা?"

"কিশোরীকাকা ফিরেছেন কি?"

"না। তবে আজই ফেরার কথা।"

"তাহলে আপনিই ব্যবস্থা করুন। আগামী অমাবস্যা রাত্রে বাইরে

থেকে কিছু গণ্যমান্য অতিথি আসার কথা আছে। তাঁদের ভালো ক'রে অভ্যর্থনা করতে হবে। আমাদের বাগান বাড়িটাও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো হওয়া চাই।"

"যে আজ্ঞে। ক'জন অতিথি আসবেন?"

"তা একশ'র কম নয়। বেশীও হ'তে পারে। আপনি দু'শ লোকের জন্য ব্যবস্থা করুন।"

নায়েবের চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

"তাহলে তো পুকুরে জাল ফেলাতে হয়।"

"ফেলান। দুধ দই ক্ষীর আনবার জন্য মহালে মহালে লোক পাঠিয়ে দিন।

কয়েকজন ভালো রাঁধুনী চাই। ময়রাদেরও খবর দিন, বাড়ীতে ভিয়ান বসবে। নহবতখানাটাও সাজিয়ে ফেলতে বলুন—"

"নবত্ বসবে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো জমিরুদ্দিনকে খবর দিতে হয়।"

"অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই সে আসুক তার লোকজন নিয়ে। হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতে হবে। সেদিন খুব ধুমধাম ক'রে কালীপূজোও করব। সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজাতে হবে। কুমোর বাড়ি থেকে হাজার দুই প্রদীপও আনিয়ে নিন। আমাদের ঝাড় লণ্ঠনগুলোও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন।"

নায়েবমশাই উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে বিব্রতও হচ্ছিলেন। একটু চেষ্টা করলেন যাতে ঝঞ্ঝাটটা কমে।

"অকালে দীপাবলী করবেন? কাল তো কালীপূজো নয়। শেষকালে কোনও অমঙ্গল হবে না তো?"

"অকালবোধন ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের তো মঙ্গলই হয়েছিল। আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি মানত করেছিলাম, সেই মানত শোধ করছি। অমঙ্গল হবে কেন তাতে? আপনি সব ব্যবস্থা

ক'রে ফেলুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমাদের পালকির বেয়ারা ক'জন আছে ?"

"তা জন কুড়ি হবে।"

"আরও ষাট সত্তর জন বেয়ারা দরকার হবে যে সেদিন। আমাদের সব কটা পালকিই বেরুবে সেদিন। মেয়েরা সবাই নদীতে স্নান করতে যাবে সন্ধেবেলা, তারপর সবাই অঞ্জলি দেবে। আর বেয়ারা পাওয়া যাবে না ?"

"চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন। তবে বেশী মজুরি চাইবে হয়তো—"

"বেশী মজুরিই দেবেন। অন্তত আশী পঁচাশী জন বেয়ারা সেদিন সন্ধ্যাবেলা হাজির থাকা চাই। কিশোরীকাকা যদি ফিরে আসেন বলবেন তাঁকে, আর তিনি যদি না-ও এসে পৌঁছন আপনিই ব্যবস্থা ক'রে ফেলবেন। আমার নামে খরচ লিখে আপনি শ'পাঁচেক টাকা এখুনি খাজাঞ্চিখানা থেকে নিয়ে নিন। আমি হুকুমনামা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি আরও দরকার হয় তা-ও দেব। কিন্তু যা যা বললাম তা যেন সব ঠিক মতো হয়।"

টাকার অঙ্কটা শুনে নায়েব মশায় একটু আর্দ্র হলেন। কারণ তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন এই ধরণের খামখেয়ালী ব্যাপারে যে সব টাকা জলের মতো খরচ হয় তার পাই-পয়সা হিসেব কেউ চায় না, দেয়ও না। সমুদ্রবিলাসের আমলে এসব হামেসাই ঘটত। সেই বাপেরই বেটি তো, এ-ও শুরু করেছে এইবার। মনে মনে খুব খুশী হলেন তিনি।

মুখে বললেন, "তা হবে বইকি মা। আপনি যখন ইচ্ছা করছেন, সব হবে। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি—"

সুদক্ষ সেনাপতিরা যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনাটা আগে থাকতে নিখুঁত ভাবে করে রাখেন, মহারাণীও তেমনি সমস্ত রাত জেগে পরিকল্পনা করে ফেলেছিল একটা। নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা হবার পর আর

ঘুমোয়নি সে। সে ঠিক করেছিল উদয়প্রতাপের সঙ্গে ভদ্রতার চূড়ান্ত করবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার ধারণা হয় যে বিবাহের আয়োজনই বুঝি করা হয়েছে। তারপর উদয়-প্রতাপকে বলতে হবে যে বাড়ির মেয়েরা জল সইতে যাবে পালকি ক'রে। এতে সম্ভবত সে আপত্তি করবে না। কুড়িটা পালকি যখন একে একে বেরিয়ে যাবে তখন একটা পালকিতে সে নানা-সাহেবকে অনায়াসে বাড়ির বার করে দিতে পারবে। নানাসাহেব নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলে তখন বোঝা-পড়া করা যাবে উদয়প্রতাপের সঙ্গে। বুদ্ধির যুদ্ধে জিতবে কিনা সেটা নির্ভর করবে অবশ্য শ্রীহর্ষের অভিনয়-দক্ষতার উপর।

...মহারাণীর পরিকল্পনায় কিন্তু একটু খুঁত ছিল। ছাত-বাগানে বন্দিনী রঞ্জাবতীর সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথাটা কল্পনায় আসেনি তার। একথাও তার মনে ছিল না যে ছাতের যে ঘরে রঞ্জাবতী আছে সে ঘর থেকে শিব-মন্দিরের ভিতর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শিবমন্দিরে যে একজন অচেনা লোক এসে ঢুকেছে এটা রঞ্জাবতীও দেখতে পেয়েছিল রাত্রে।

মহারাজের গর্জনে তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে এসে সে-ও দাঁড়িয়েছিল। তার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হ'ল যখন সে দেখতে পেলে মহারাণীও খিড়কি-বাগানে নেমে এসেছে। আড়ি-পাতা তার স্বভাব, নিজেকে আড়াল ক'রে আলসের ফাঁক দিয়ে সব দেখেছিল সে। মহারাণী এত রাত্রে সিংহের মহলে এল কেন? তারপর সে দেখতে পেল কষ্টির হাতছানি। দেখল মহারাণী মন্দিরে গেল, মহারাণীর সঙ্গে মন্দির থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। দেখল মহারাণী নিজে তার জন্যে বিছানা, খাবার, এমন কি জল পর্যন্ত বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ গোপনতা কাকে কেন্দ্র করে? নানাসাহেবের কথা সে আগেই শুনেছিল। ঘোর সন্দেহ হ'ল তার।

মহারাণী আবার দোলনায় তুলছিল মনে মনে। সে দোলনা কখনও নিয়ে যাচ্ছিল তাকে আকাশে, আবার পরমুহূর্তে নামিয়ে আনছিল মর্তে। শ্রীহর্ষ কি রাজী হবেন না? হতেই হবে তাকে। এখনও আসছে না কেন?

শৌরসেনীকে আবার ডাকল মহারাণী।

"শ্রীহর্ষকে কে ডাকতে গেছে?"

"নটবরকে পাঠিয়েছিলাম বাইরে থেকে।"

"এখনও আসছে না কেন? আবার লোক পাঠা। তুই না হয় নিজেই যা পালকিটা নিয়ে। আমি একটা চিঠিও দিচ্ছি।"

চিঠিতে একটি ছত্র শুধু লিখলে সে।

"অবিলম্বে চ'লে এস। জীবন-মরণ সমস্যা।"

চিঠিখানা খামে পুরে বললে, "তার হাতেই দিবি এটা। অন্য কারো হাতে যেন না পড়ে।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল শৌরসেনী।

তারপরই রঞ্জাবতীর দাসী ললিতা এল।

"রঞ্জাদিদি একবার তাঁর কিশোরী দাদুর কাছে যেতে চাইছেন। বলছেন অনেকদিন খবর পাননি, মন কেমন করছে। যাবেন কি?"

"কিশোরীকাকা তো এখানে নেই।"

"খবর নিলাম একটু আগেই ফিরেছেন।"

"বেশ যাক। কিশোরীকাকাকে আমারও দরকার একবার। রঞ্জা যেন তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। দরকারটা জরুরী।"

একটু পরেই রঞ্জাবতীর পালকি বেরিয়ে গেল হুমব্রো হুমব্রো ক'রে।

মহারাণী আবার দুলতে লাগল দোলনায়।

তিন

স্নানান্তে বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে শ্রীহর্ষ এলেন।

মহারাণী নিজের শোবার ঘরে পালঙ্কের উপর বসে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল।

"কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব কেন? উপর্য্যুপরি দুবার লোক গেল।"

"জরুরী বলেই দু'বার গেল। বস বলছি সব। এখানেই বস না।"

"এই যে বসছি —"

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন শ্রীহর্ষ।

"কেন, আমার পাশে বসলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত বুঝি।"

শ্রীহর্ষ মৃদু হেসে বললেন, "পাশে বসতেই তো চেয়েছিলাম একদিন। তখন তো রাজি হওনি। এখন লগ্ন বয়ে গেছে। তোমার জরুরী দরকারটা কি বল—"

শ্রীহর্ষের মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল মহারাণী। তারপর বলল, "শুনে হয়ত সুখী হবে আমার মৃত্যু আসন্ন।"

"কি রকম।"

"স্বয়ং যম এবার বর-বেশে আসছে।"

"হেঁয়ালিটা ভেঙে বল।"

মহারাণী উদয়প্রতাপ-সম্পর্কিত ঘটনাগুলো একে একে বলে গেল। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল তিনি যেন একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনছেন।

"কাল আসবে উদয়প্রতাপ?"

"চিঠি তো দেখলে।"

"আমার মনে হয় অবিলম্বে মহেন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া উচিত।"

"না, তা দেব না।"

"কেন ?"

"আমার খুশী"—তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বললে, "মেয়েমানুষ হলেও আমার আত্মসম্মান আছে।"

"তাহলে পুলিশে খবর দাও।"

"তা-ও দেওয়া যাবে না, কারণ নানাসাহেব আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে পুলিশ ডেকে তাঁকে বিপন্ন করতে পারব না।"

"নানাসাহেব !"

আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীহর্ষ।

"নানাসাহেব তোমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ? কোথা আছেন ?"

"খিড়কি বাগানে, শিবমন্দিরে।"

"কি করবে তাহলে এখন।"

"সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

"আমি কি করতে পারি বল।"

"বলছি।"

নিজের পরিকল্পনাটা তখন বললে সে। শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। মহারাণী বুদ্ধিমতী তা তিনি জানতেন, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা তিনি করেননি। বললেন, পরিকল্পনা তোমার চমৎকার হয়েছে। আমি এসে কালীপূজো ক'রে দেব, নানাসাহেব যদি পালকি ক'রে আমার বাড়িতে পৌঁছে যান তাহলে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য পাতাল-ঘরে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না। সর্বমঙ্গলাকে বলে এলে আমি না ফেরা পর্যন্ত সে কাউকে বাড়িতেও ঢুকতে দেবে না। কিন্তু তুমি যে মিথ্যে কথাগুলো আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছ ওটা আমি পারব না। ওটা আর কাউকে দিয়ে করাও তুমি—"

"আমার মান-প্রাণ রক্ষার জন্যে সামান্য দু'একটা মিছে কথা বলতে পারবে না তুমি! আশ্চর্য!"

"নিজের মান-প্রাণ রক্ষার জন্যেও পারব না। মিছে কথা কখনও বলিনে যে। আর কেউ বলুক না।"

"একথা আমি আর কাউকে বলিনি, বলবও না। তুমি যদি সত্যকে আঁকড়ে আমাকে ডাকাতের হাতে তুলে দিতে চাও, দিও।"

বিপন্ন মুখে চুপ ক'রে গেলেন শ্রীহর্ষ।

মহারাণী নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ তার নীচের ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। শ্রীহর্ষ দেখলেন তার চোখে জল টলমল করছে।

"ও কি! আচ্ছা তাই হবে। যা বলছ তাই করব। মিছে কথা বলিনি কিনা—"

মহারাণী স্থির কণ্ঠেই উত্তর দিত, কিন্তু গলা কেঁপে গেল তার।

"বলতে হবে না। চলে যাও তুমি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

বিছানার উপর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সে।

শ্রীহর্ষ আরও বিব্রত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

শ্রীহর্ষ চলে গেলেন একটু পরে। মহারাণী উঠে বসল। বসেই রইল খানিকক্ষণ। তার মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সে আবার নূতন ক'রে যেন অনুভব করল শ্রীহর্ষ তাকে ভালবাসে না। শেষ পর্যন্ত সে রাজি হ'ল বটে কিন্তু সেটা ভদ্রতার খাতিরে, ভালবাসে বলে নয়। খোলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে আকাশের দিকে।

...চমক ভাঙল মহারাজের ডাক শুনে। নিমেষের মধ্যে মনে পড়ল এখনও অনেক কাজ বাকী। নানাসাহেবকে খেতে দিতে হবে, কষ্টিকেও বুঝিয়ে বলতে হবে। ব্যাপারটা তাকে এখনও কিছু বলাই হয়নি।

মহারাণী নেমে গেল খিড়কির বাগানে। প্রথমেই গেল মহারাজের ঘরে। অনেকক্ষণ ধ'রে আদর করল তাকে। তার পিঠে চ'ড়ে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে

বললে, "তুই আমাকে বাঁচাতে পারবি তো? পারবি? উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

মহারাজের গলা থেকে গরগর গরগর শব্দ বেরুতে লাগল। তারপর গেল সে কষ্টির ঘরে। কষ্টিকে বুঝিয়ে বললে সব। চোখ বড় বড় ক'রে কষ্টি শুনতে লাগল।

"ঠিক পারবি তো?"

কষ্টি ঘাড় নেড়ে জানালে, পারবে।

তারপর সে গেল নানাসাহেবের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

সাজিতে ফল, মিষ্টান্ন এবং ঝারিতে দুধ নিয়ে নানাসাহেবের কাছে গিয়ে দেখল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো তিনি পরিক্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। ঘরের কোণে সে যেমন ভাবে বিছানা পেতে দিয়ে গিয়েছিল তা ঠিক তেমনি ভাবেই পাতা রয়েছে। দেখে মনে হ'ল না যে তিনি তাতে শুয়েছিলেন। খাবারও স্পর্শ করেননি।

"আপনি কিছু খাননি দেখছি।"

"না। খেতে ইচ্ছে করে না।"

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিলেন।

"ঘুমোননি?"

"না। ঘুম আসে না।"

"আপনাকে তো বলে গেলাম আমি, চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনি বিশ্রাম করুন।"

"চিন্তার কারণ বাইরে নেই, এইখানে আছে।"

এই বলে প্রথমে তিনি বুকে তারপর মাথায় হাত দিলেন।

তারপর হঠাৎ ঝুঁকে মহারাণীর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "একটা কথা জানেন না বোধহয়। আমি পাপী, মহাপাপী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।"

"বিশ্বাসঘাতকতা? কবে—"

"শুনবেন সব কথা ?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন একটা আকুল আগ্রহ ফুটে উঠল। কথাটা বলে যেন মনের ভার লাঘব করতে চান।

"বলুন।"

"শুনুন। কানপুরে অনেক ইংরেজ পরিবারকে ঘেরাও করেছিলাম শহরের দক্ষিণপূর্ব কোণের একটা বাড়িতে। হুইলার সাহেব তাদের বাঁচাবার জন্যে লড়েছিলেন, খুব লড়েছিলেন তিনি। আমাদের অনেক সিপাহী জখম হচ্ছিল। ৮ই জুন থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত লড়েছিল তারা। শেষকালে আমি তাদের একটা প্রস্তাব পাঠালাম যে তারা যদি অবিলম্বে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে নৌকো ক'রে তাদের এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তারা আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু যখন তারা নৌকোয় চড়ল, নৌকো যখন মাঝ দরিয়ায়, তখন সামলাতে পারলাম না আমি, শর্তের কথা ভুলে গেলাম, তাঁতিয়া তোপীও আমাকে বললে এতগুলো দুষমনকে এত সহজে ধ্বংস করবার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। হুকুম দিলাম, গুলি চালাও নৌকোর উপর। চার পাঁচজন সাঁতরে পালিয়েছিল কেবল, বাকী সব মারা যায়। তাদের মধ্যে অনেক আওরাৎ ছিল, অনেক বাচ্চা ছিল, অনেক বুড়ো ছিল, রোগী ছিল।"

পিছনে দুহাত নিবদ্ধ ক'রে নানাসাহেব আবার পরিক্রমণ করতে লাগলেন। তারপর মহারাণীর সামনে হঠাৎ থেমে একটু ঝুঁকে আবার বললেন, "বিবিগড়ে যে সব ইংরেজ বন্দী হয়েছিল তাদেরও হত্যা করেছিলাম। তাদের মধ্যেও অনেক আওরৎ ছিল, বাচ্চা ছিল। আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু তাদের আর্তনাদ আমি সর্বদা শুনতে পাই। ঘুম হয় না—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

আবার থেমে বললেন, "আমার মনে হয় এই পাপেই লছমীবাই

মারা গেছে, তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়েছে, এই রাগেই হড্‌সন্‌ গুলি ক'রে মেরেছে বাহাতুর শাহর পুত্র পৌত্রদের, লোপ ক'রে দিয়েছে মোগল বংশ। এইবার আমার পালা—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

"ওসব ভেবে অনর্থক মন খারাপ করবেন না। যুদ্ধের সময় শত্রুর প্রতি দয়া করলে চলে না। ওরাও কি আপনাদের উপর দয়া করেছে ? করেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনাকে রক্ষা করব। আমার কাছ থেকে অন্তত পুলিশ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না—"

"কি ব্যবস্থা করেছ শুনি।"

"আপনি নদীতীরে কখন যেতে চান ?"

"রাত তুপুরে। সপ্তর্ষি অস্ত যাবার পর ওরা ছিপ নিয়ে আসবে বলেছে। নদীতীরে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, তার ওপর আমাকে থাকতে বলেছে।"

"তাহলে শুনুন আমি কি ব্যবস্থা করেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে ওই নদীর কাছেই। তার বাড়িতে মাটির নীচে পাতাল-ঘর আছে একটা। অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার পর একটা পালকি ক'রে সেখানে আপনি যাবেন, গিয়ে সেই পাতাল-ঘরে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর রাত তুপুরে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন নদীর দিকে। ওদের বাড়ি থেকে নদী প্রায় আধ-ক্রোশ দূরে। ওদের খিড়কি দরজা থেকে বেরিয়েই রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যাবেন।"

"পালকি ক'রে যাবার সময় কেউ দেখতে পায় যদি—"

"পাবে না। আমার একটা দোতলা পালকি আছে। তার ছাতটা বাক্সের মতো খোলা যায়। একজন অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে তাতে। আপনি তার ভিতরই যাবেন, নীচে থাকবে আমার একজন বিশ্বস্ত দাসী। পালকি আগা-গোড়া বোরখা ঢাকা থাকবে—"

চুপ ক'রে রইলেন নানাসাহেব।

মহারাণী বলল, "কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। কিছু খেয়ে বিশ্রাম করুন।"

ম্লান হাসি হেসে নানাসাহেব ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানালেন। দুজনের এতক্ষণ আলাপ হ'ল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাতে অসুবিধা হ'ল না কারও। মনের একটা ভাষা আছে যা সর্বজনীন, যার প্রকাশ চোখমুখের ভাব-ভঙ্গীতে, শব্দের উপর যা নির্ভরশীল নয়।

নানাসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহারাণী কষ্টির কাছে গেল। রঞ্জাবতী কিন্তু দোতলার ঘরে ঠায় বসে ছিল জানলার ফাঁকে চোখ দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

পরিকল্পনাটি বলার সময়েই মহারাণী শ্রীহর্ষকে বলেছিল নানাসাহেবের খবরটা তিনি যেন সর্বমঙ্গলাকে এমনভাবে বলেন যাতে নানাসাহেবের খবরটা সে যেন জানতে না পারে। সর্বমঙ্গলাকে গোপন ক'রে নানাসাহেবকে পাতাল ঘরে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, সে সময়ে শ্রীহর্ষও বাড়িতে থাকবেন না, তাঁকে কালীপুজো নিয়ে থাকতে হবে। সর্বমঙ্গলার কাছেই নানাসাহেবকে পাঠাতে হবে, কিন্তু মহারাণীর মতে আশ্রিত ব্যক্তিটি যে নানাসাহেব একথা সর্বমঙ্গলার না জানাই ভালো—হয়তো ভয় পাবে, যদি গল্পচ্ছলে কখনও কাউকে বলে ফেলে তাহলেও বিপদের সম্ভাবনা। শ্রীহর্ষ ফিরবার সময় ভাবতে ভাবতে আসছিলেন কি বলবেন সর্বমঙ্গলাকে। বাড়ি পৌঁছবামাত্র সর্বমঙ্গলা জিগ্যেস করলো, "রাণীর দরবারে ডাক পড়েছিল কেন?

"কাল অমাবস্যা। কালীপুজো করতে হবে।"

"ওদের তো বাঁধা পুরুত আছেন?"

"কাল একটু ধুমধাম করতে চায়, বলছে মানত ছিল, তাই আমাকে অনুরোধ করেছে। আলো-টালো জ্বলবে খুব—"

সর্বমঙ্গলা চুপ ক'রে রইল।

"কাল আর এক ঝঞ্ঝাট হবে, আর সেটা পোয়াতে হবে তোমাকে।"

"সেটা আবার কি ?"

"একজন ফেরারি আসামী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে মহারাণীর নিজের লোক। কাল সন্ধ্যার পর সে পালকি ক'রে এখানে আসবে। মহারাণীর অনুরোধ, তাকে খানিকক্ষণের জন্য পাতাল-ঘরে লুকিয়ে রাখতে হবে। রাত দুপুরের পর সে খিড়কি দিয়ে নদীর ধারে চলে যাবে।"

"আমাদের পাতাল-ঘরে ?"

"হ্যাঁ। আমি তখন থাকব না, তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।"

সর্বমঙ্গলা আবার চুপ ক'রে গেল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে ?"

"উত্তর আর কি দেব। বলছ যখন, করব। কিন্তু মনে কর খবর পেয়ে পুলিশ যদি এসে খানাতল্লাসী করতে চায় ?"

"পুলিশ খুব সম্ভবত আসবে না। আর যদি এসেই পড়ে, ভয় কি, বাধা দেবে। বলবে আমার স্বামী না আসা পর্যন্ত খানাতল্লসী হবে না। তিনি আসুন, তারপর যা-হয় কোরো। পারবে না বলতে ?"

"পারব।"

চার

অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই ধুম পড়ে গেল মহারাণীর বাড়িতে। জমিরুদ্দিনের দল খুব ভোরে এসেই শুরু করলে ভৈরোঁ। একদল চাকর গেল বাগান বাড়িটা পরিষ্কার করবার জন্যে, আর একদল বাইরের মহলটা সাজাতে লাগল। অতিথিশালার ঘরে ঘরে বিছানো হতে লাগল দামী দামী কারপেট, ভারী ভারী তাকিয়াগুলোতে পরানো হতে লাগল ফরসা ওয়াড়, ফরসী-গড়গড়া-হুঁকো-সটকা তামাক খাওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হুঁকো-বরদার পিয়ারী। সিন্দুক থেকে বাসন বার করা হ'ল রাশি রাশি, পিতলের কাঁসার রূপোর পাথরের, সেগুলো পরিষ্কার করতে লাগল একদল ঝি। কুটনো কোটার ভার নিলে অন্দরের মেয়েরা, লাউ কুমড়ো আলু বেগুনের স্তূপ নিয়ে বসে গেল সবাই। দশজন রাঁধুনী দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড চালাটায় বড় বড় উনুন কেটে বড় বড় চেলা-কাঠের সাহায্যে আঁচ দিয়ে দিলে ভোর থেকেই, ডাল আর অম্বলটা তারা আগে রেঁধে ফেলবে। তারপর মহাল থেকে জিনিসপত্র আনা শুরু হ'ল। ভারে ভারে দুধ দই ছানা মাখন ঘি তেল। বড় বড় রুই কাতলাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, সদ্য-ধরা জ্যান্ত মাছ সব, খাবি খাচ্ছে তখনও। উত্তর দিকের উঠোনে স্তূপীকৃত হ'ল মাছগুলো, জেলেরা সঙ্গে বড় বড় বঁটিও এনেছিল, হৈ হৈ ক'রে মাছ কুটতে লেগে গেল সবাই। পালকি বইবার জন্য আশী জন বেয়ারাও জোগাড় ক'রে ফেলেছিলেন নায়েব মশাই, তারাও একে একে আসতে লাগল আর তাদেরও নানা কাজে লাগিয়ে দিলেন তিনি। কতকগুলোকে নিযুক্ত করলেন প্রকাণ্ড একখানা সামিয়ানা খাটাতে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেইখানেই সামিয়ানা

খাটানো সাব্যস্ত করলেন তিনি, অতিথিশালায় যদি স্থানাভাব ঘটে এইখানে বসানো হবে কিছু লোককে। দীপাবলীর জন্য যে প্রদীপগুলো এসেছিল সেগুলোকে ভিজিয়ে শুকিয়ে, তেল-সলতে দিয়ে সাজিয়ে রাখতে আদেশ দিলেন কয়েকজনকে, ছাতটা পরিষ্কার করতে লাগল জনকয়েক, ফুল আর দেবদারু পাতা সংগ্রহ করতে গেল কয়েকজন, কলা-গাছের জন্যও জনকয়েক গেল। অন্দর মহলের প্রশস্ত বারান্দায় শিল পড়ে গেল কুড়ি-পঁচিশটা, নানা বয়সের ঝিয়ের দল মশলা বাটতে লাগল গাছ-কোমর বেঁধে। তাদের মুখে মুখে পান-দোক্তা দিয়ে বেড়াতে লাগল একজন। বারোটি কুচকুচে কালো নধর পাঁঠা নিয়ে বাইরের মহলে প্রবেশ করল খাঁড়া হাতে বলিষ্ঠ জগু কামার। মা কালীর নিত্য পূজারী অবিনাশ ঠাকুর সেগুলিকে মন্ত্রঃপূত করে মায়ের কাছে উৎসর্গ ক'রে দিলেন। সেগুলিকে মায়ের সামনে বলিদান দেওয়া হবে। জগুই কাটবে। সেকালে হিন্দুঘরে বৃথা-মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল না, মাংস খেতে হ'লে আগে সেটা মায়ের প্রসাদী ক'রে নিতে হ'ত। অবিনাশ ঠাকুর প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, "একটা পাঁঠা রেখে দাও। রাত বারোটার সময় শ্রীহর্ষ ঠাকুর যে পূজোটা করবেন তাতে দরকার হবে।" বাকী পাঁঠাগুলো তিনি একে একে উৎসর্গ করতে লাগলেন আর জগু হাড়-কাঠে ফেলে কাটতে লাগল। মা কালীর মন্দিরের সামনে হাড়-কাঠ পোঁতাই ছিল একটা। বলিদান শেষ ক'রে জগুই পাঁঠাগুলোকে নিয়ে গেল পিছন দিকের আর একটা আটচালায়, জন কয়েক বাগদী সাহায্যকারীও সঙ্গে গেল তার। পাঁঠাগুলোকে ছ'ড়ে কেটে তৈরী ক'রে তবে তার ছুটি। মাংস-পোলাও রান্না করবার জন্যে আলাদা রাঁধুনি এসেছিল জনকয়েক। মাংস পোলাওয়ের জন্য বিশেষ মশলা আর বাসন তারা আলাদা ক'রে রাখতে লাগল। সিধু মুহুরী একটা ঢাকা ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নায়েব মশায়ের কানে কানে রহস্যময়

ভাবে কি বললেন। নায়েব মশাই আদেশ দিলেন, "ওই কোণের ঘরে সাবধানে রাখ ওগুলো।" কয়েক বোতল মদ, কিছু গাঁজা এবং গাঁজার কলকে নিয়ে এসেছিলেন সিধু মুহুরী। যারা মেহনত করছে তাদের মধ্যে অনেকে গাঁজা খায়, মাঝে মাঝে গাঁজায় দম না দিলে কাজে উৎসাহ পাবে না তারা। আর 'কারণ' তো কালী পূজোর অঙ্গ, অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ চাইতে পারেন।

কিশোরীমোহন কিন্তু এবারও এলেন না। তাঁর জন্যে অবশ্য আটকাল না কিছু। মুহুরী আমলারা তদ্বির তদারক করছিল, আর বৃদ্ধ নায়েব মশাই চরকির মতো ঘুরছিলেন চারদিকে।

নহবতে বাজতে লাগল ভৈরোঁর পর ভৈরবী, তারপর আশাবরী। এইভাবে সমস্ত দিন চলল।

সন্ধেবেলা যে কি হবে, অতিথিরা কখন আসবে, তা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলল না মহারাণী। কেউ তাকে জিগ্যেস করতেও সাহস করলে না। অন্দরমহলে সিন্ধুবালা আর কুসুমের দল নিজেদের বিভিন্ন অনুমানকে ধ্রুব-সত্য মনে ক'রে সোৎসাহে কাজ করে যাচ্ছিল। উলকি মোনার মাকে এসে ফিস ফিস ক'রে বললে, "মহারাণীর মুখটি শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।" গোবরার মা চোখ মোটকে বললেন, "এতেও যদি মুখ না শুকোয়, কিসে আর শুকুবে বল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে শয্যা নিত।" কুসুমের দলের মুকুজ্যে গিন্নি কিন্তু মহারাণীর অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি কুসুমের কানে কানে বললেন, "ধন্যি মেয়ে বটে। মাথার উপরে অত বড় একটা ফাঁড়া ঝুলছে, কিন্তু গেরাজ্যি নেই। চান ক'রে এসে ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকুচ্ছে শুনলাম!" নায়েব মশাইও নিজের কল্পনা অনুসারে এর অর্থ করেছিলেন একটা। তিনি ভেবেছিলেন কিশোরীমোহন কিম্বা মহেন্দ্রনাথের চেষ্টায় মহারাণীর বিয়েরই সম্বন্ধ হচ্ছে বোধহয় কোথাও, পাত্রপক্ষ আজ দেখতে আসছে। কিন্তু কিশোরীমোহন বা মহেন্দ্রনাথ কাউকে দেখতে না

পেয়ে মাঝে মাঝে খটকাও লাগছিল তাঁর। মহারাণী নিজের বিয়ের আয়োজন নিজেই হামরাই হয়ে করছে এটা তাঁর ভাল লাগছিল না। তিনি আশা করছিলেন বিকেল নাগাদ কেউ হয়তো এসে পড়বেন।

...বিকেলের দিকে (জমিরুদ্দিন তখন পূরবী ধরেছে) অন্দর থেকে মহারাণীর হুকুম এল, শ্রীহর্ষের বাড়িতে দুটি খালি পালকি যাবে। চিঠিও যাবে একটি। চিঠিতে মহারাণী শ্রীহর্ষকে লিখল, "একটি পালকিতে তুমি চলে এস। দ্বিতীয় পালকিটি তোমার ওখানেই থাকবে। কেন থাকবে তা পরে শুনো।"

সন্ধ্যাবেলা আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ঝলমল করতে লাগল বাড়িটা। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে অতিথিরা কখন আসবে। সকলের সাগ্রহ প্রতীক্ষা একটা অদৃশ্য উৎসুক পরিবেশ সৃষ্টি করছে চতুর্দিকে, সমস্ত বাড়িটাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। প্রদীপের শিখাগুলো পর্যন্ত নিষ্কম্প। জমিরুদ্দিন ইমনে তান ধরেছে। মহারাণী অপেক্ষা করছিল শ্রীহর্ষের জন্য। পাতালঘরের বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে নিশ্চিতরূপে এ খবর পাবার পর তবে সে নানাসাহেবকে পাঠাবে। খিড়কি-বাগানে মন্দিরের কাছে দোতলা পালকিটি সে সন্ধের পর থেকেই দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এমন ব্যবস্থা করেছে যে শৌরসেনী পালকির নীচের তলায় ব'সে নানাসাহেবের সঙ্গে যাবে, কিন্তু সে-ও জানতে পারবে না যে দোতলায় তার মাথার উপর নানাসাহেব শুয়ে আছেন। মহারাণী বিকেলেই শৌরসেনীকে বলে রেখেছে, "সর্বমঙ্গলার জন্যে পালকি পাঠাতে হবে। তুই পালকি নিয়ে যাবি, তোর হাতে চিঠিও দেব একটা। তুই চিঠিটা দিয়ে পালকিটা রেখে চলে আসিস। সেখানে আর একটা পালকি আছে। সর্বমঙ্গলা কিছু জিনিসপত্র আনবে, তার জন্যে বড় পালকিটা রেখে আসিস।"

অন্ধকার হতেই নানাসাহেব একটা ছোট সিঁড়ির সাহায্যে পালকির

দোতলায় উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু রঞ্জাবতী দেখেছিল। মন্দির থেকে তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি।

একটু পরেই শ্রীহর্ষ তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে এসে পড়লেন। মহারাণীকে বললেন, "ওদিকে সব ঠিক আছে, পালকি পাঠাতে পার।"

শৌরসেনী গিয়ে পালকিতে উঠল, পালকি অন্দর থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় দুম দুম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল কয়েকটা, তারপরই ঘোড়ার খুরের শব্দ। মনে হ'ল একদল অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অন্দরমহলের ঘণ্টা। একজন দাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—নায়েক মশাই বললেন, একজন সাহেব এসেছে পুলিশ ফৌজ নিয়ে। তার সঙ্গে কালেক্‌টারের পরওয়ানা আছে, সে এখুনি বাড়ি খানাতল্লাসী করবে। পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।"

মহারাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শ্রীহর্ষের দিকে ফিরে বলল, "তুমি সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। দেখা ক'রে বল একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ি এমন ভাবে খানাতল্লাসী করা খুবই অপমানজনক। আমার বাবা গর্ভনমেণ্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আমিও সে বন্ধুত্ব অটুট রেখেছি। তবু এ অপমান তাঁরা যদি করতেই চান তাহলে অন্দরের মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেবার অনুমতি তাঁরা আশা করি দেবেন। মেয়েরা ঢাকা পালকিতে আগে একে একে আমার বাগানবাড়িতে চ'লে যাক, তারপর তাঁরা অন্দরে ঢুকুন। তাঁদের যদি সন্দেহ হয় পালকি সিংহদরজা থেকে বেরুবার সময় তাঁরা দেখে নিতে পারেন পালকিতে মেয়ে-সোওয়ারি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অবশ্য বাড়িতেই থাকব।"

শ্রীহর্ষ বাইরে চলে গেলেন।

পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করেছে এ খবর রঞ্জাবতীর কাছেও পৌঁছেছিল। উত্তেজিত হয়ে নেবে এসেছিল সে। মহারাণী তাকে

দেখে বলল, "পুলিশ বাড়ি খানাতল্লাসী করবে, তৈরি হয়ে নে, তোদের সব বাগান-বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

"আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না কোথাও।"

"তাহলে আর সবাইকে খবর দে।"

শ্রীহর্ষ ফিরে এলেন।

বললেন, "ক্যাপ্টেন সাহেব বলছেন খানাতল্লাসী তাঁকে করতেই হবে, কালেক্টার সাহেবের কড়া হুকুম। তবে মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু বেরিয়ে যাবার আগে প্রত্যেক পালকিটি তাঁরা দেখে তবে যেতে দেবেন।"

অন্দরমহলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। কুসুম ভাবলেন, পুলিশ বোধহয় তাঁর সেই কাকাই পাঠিয়েছেন। মোনার মা মনে করলেন, বৃন্দাবন থেকে সিন্ধুবালা কলকাঠি নাড়ছেন। দুজনেই মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করলেন। বাকী সকলের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। কাঁদতে লাগল কেউ কেউ।

মহারাণী আশ্বাস দিল সকলকে, "ভয় কি। এখুনি আবার ফিরে আসবে সবাই।"

সে নিজে দাঁড়িয়ে পালকিতে চড়াতে লাগল সকলকে। রঙ্গাবতীও আছে। দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে লাগল। যেমন ঠিক ছিল শৌরসেনী নানাসাহেবের পালকিতে উঠল।

মহারাণী তাকে আবার বলল, "এ পালকিটা শ্রীহর্ষের বাড়ি যাবে। সর্বমঙ্গলার জন্যে এ পালকিটা থাকবে সেখানে। পূজোর সময় সর্বমঙ্গলা আসবে। তুই চিঠিটা সর্বমঙ্গলাকে দিয়ে বাগান বাড়িতেই চলে যাস। ওখানে তোর ফেরবার জন্য একটা পালকি আছে—"

সর্বমঙ্গলাকে চিঠি লিখেই রেখেছিল সে।

"রাত দুপুরে তুমি এস সব কাজ চুকিয়ে। সেই সময়ই পূজো হবে। সব জিনিস নিয়ে এস। পালকি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।"

রঙ্গাবতী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সব শুনলে সে। তার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

...পালকি বেরুতে লাগল একে একে।

ক্যাপ্‌টেন সাহেব সিংহদরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রত্যেক পালকি বেরুবার আগে তিনি ঢাকা তুলে তুলে দেখতে লাগলেন। নানাসাহেবের পালকিটা শেষের দিকে ছিল। সেটার ঢাকা তুলেও দেখলেন তিনি। রূপসী শৌরসেনী নত নেত্রে বসে ছিল জড়সড় হয়ে। তাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন সাহেব যে পালকিটা যে অন্যান্য পালকির চেয়ে বড় তা লক্ষ্য করবারই অবসর পেলেন না।

"পাস্‌—"

নানাসাহেবের পালকি বেরিয়ে গেল।

তারপর পুলিশ ঢুকল অন্দরমহলে। সমস্ত ঘর খোলাই ছিল, প্রত্যেক ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা। তারপর গেল খিড়কির বাগানে। মশাল জ্বেলে জ্বেলে প্রত্যেক গাছের তলায় তলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, বড় গাছগুলোর উপরেও চড়ল। মহারাজের মহলের কাছে আসতেই গগনবিদারী গর্জন ক'রে মহারাজ সম্বর্ধনা করল তাদের। শ্রীহর্ষও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তিনি বললেন, "মহারাণীর পোষা সিংহ।" ক্যাপ্টেন-সাহেব অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন সিংহটাকে, তারপর বললেন, "রেআর আফ্রিকান ভ্যারাইটি।"

কষ্টি চোখ বড় বড় ক'রে বসে ছিল নিজের ঘরে।

শ্রীহর্ষ বললেন, "এও কঙ্গো দেশের মেয়ে। ওই সিংহের সেবা করে।"

ক্যাপ্টেন সাহেব মুখ ছুঁচলো ক'রে ছোট্ট শিস দিলেন একটা।

বাগান খোঁজা শেষ ক'রে তারপর তাঁরা ঢুকলেন মহারাণীর মহলে। মহারাণী দোলনায় দুলছিল, সাহেব যখন এল তখন ভ্রূক্ষেপও করল না, যেমন দুলছিল তেমনি দুলতে লাগল।

শ্রীহর্ষ পরিচয় দিলেন, "ইনিই স্টেটের মালিক, মহারাণী চৌধুরাণী—"

সাহেব বাঁ হাত দিয়ে মাথার হ্যাটটা তুললেন একবার।

মহারাণী চেয়েও দেখলো না সেদিকে, যেমন দুলছিল, দুলতে লাগল।

সাহেব বললেন, "আমি প্রতি ঘরে ঘরে ঢুকে দেখতে চাই।"

শ্রীহর্ষ উত্তর দিলেন, "আস্থন, আমি দেখাচ্ছি—"

ঘরে ঢোকবার আগে সাহেব তাঁর সহকারীকে বললেন, "তুমি ছাতটা দেখে এস"—সহকারী একাই উঠে গেলেন ছাতবাগানে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। সহকারীটি এদেশী লোক, সম্ভবত গুর্খা। ছাতে গিয়েই তাঁর দেখা হ'ল রঞ্জাবতীর সঙ্গে। রঞ্জাবতী এই সুযোগই খুঁজছিল। সে যা জানত তা ব'লে দিলে তাঁকে। কিন্তু হিন্দি ভালো জানা ছিল না, তাই ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে বলতে পারলে না। তবে সহকারী ক্যাপ্টেন এইটুকু বুঝলেন যে নানাসাহেব একটু আগে' এখানে ছিল, পালকি ক'রে এখন শ্রীহর্ষ পণ্ডিতের বাড়িতে গেছে। সেখানে ফৌজ নিয়ে গেলে তাকে ধরা যাবে। তিনি তর তর ক'রে নেমে এলেন ছাত থেকে। এসে দেখলেন শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে আছে, সাহেব নীচে চ'লে গেছেন। তিনিও নীচে নেবে গেলেন। গিয়ে ক্যাপ্টেনের কানে কানে বললেন খবরটা।

"ইম্‌পসিব্‌ল্"—চেঁচিয়ে উঠলে ক্যাপ্টেন, "প্রত্যেক পালকি আমি নিজে দেখেছি।"

তাঁর আত্ম-অভিমানে যেন ঘা লাগল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন।

"শ্রীঅরসা প্যাণ্ডিৎ?"

"তাই তো বললে মেয়েটি—"

"তার বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে?"

"সেটা অসম্ভব হবে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে—"

শ্রীহর্ষই যে এতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন সে কথা জানতেই পারলেন না তাঁরা। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁরা পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন। এ অঞ্চলের কাউকেই চিনতেন না।

কিছুক্ষণ ভেবে ক্যাপ্টেন বললেন, "বেশ, চল, চেষ্টা করেই দেখা যাক।"

ক্যাপ্টেনের হুকুম পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল অশ্বারোহী ফৌজের দল।

শ্রীহর্ষ নীচে নামেন নি। মহারাণীর কাছাকাছি থাকাই সমীচীন মনে করেছিলেন তিনি। সবাই যখন চলে গেল তখন মহারাণীও নেবে পড়ল দোলনা থেকে। দুলতে দুলতে একটি কথাই ভাবছিল, সেই কথাটাই বললে।

"নানাসাহেব যে এখানে এসেছিলেন এ খবর ওরা পেল কি ক'রে?"

"সরকারের চর চারিদিকে ঘুরছে। উনি যখন দেওয়াল বেয়ে উঠলেন তখনই হয়তো দেখে ফেলেছিল কেউ—"

রঞ্জাবতীর কথা কারও মনেই হ'ল না।

"উদয়প্রতাপ আজ আর আসবে কি? এদিকে যখন ফৌজ এসেছে—"

"রাত তো খুব বেশি হয়নি। আমার মনে হয় সে ঠিক আসবে। তুমি পূজোর ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি কষ্টির খবরটা নি—"

মহারাণী নেবে গেল খিড়কির বাগানে।

শ্রীহর্ষ বাইরে পূজোর ব্যবস্থা করতে গেলেন।

পাঁচ

কালীপূজো শেষ হয়ে গেছে।

মন্দিরের মধ্যে বসে শ্রীহর্ষ সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করছেন।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ-খড়্গ বামাধোর্ধ-করাম্বুজাম
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্।
মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্

থমথমে করছে অমাবস্যার রাত্রি। সে রাত্রি যেন সহস্র উজ্জ্বল চক্ষু মেলে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। প্রদীপগুলোতে পুনরায় তেল দিয়ে উস্কে দেওয়া হয়েছে। নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে তারা। পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মশাই স'রে পড়েছেন; গোমস্তা-আমলারাও কেউ নেই। চাকর রাঁধুনিরা পালায়নি, তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা আটচালায়। জমিরুদ্দিন নহবৎখানায় ব'সে আছে, কিন্তু বাজাচ্ছে না। পূজোর সময় বাজাতে মানা করেছিলেন শ্রীহর্ষ। অতিথিদের দেখা গেলে তবে সে আবার বাজাবে। অন্দরমহল খালি। দীনা বাইজির মহলেও কেউ নেই, মহারাণী তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে বাগান বাড়িতে। সেই অতি-নিবিড় অতি-নীরব অমাবস্যা রাত্রি মথিত করে উঠছে কেবল শ্রীহর্ষের আকুল কণ্ঠস্বর।

কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্
ঘোর-দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত-ধারা বিস্ফুরিতাননাম।
ঘোর-রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্।

হঠাৎ নহবৎ বেজে উঠল, শুরু হয়ে গেল দরবারি কানাড়া।

নহবৎখানা থেকে জমিরুদ্দিন দেখতে পেয়েছিল সুসজ্জিত একটা চতুর্দোলা আসছে, আর তার সামনে-পিছনে আসছে একদল মশালধারী লোক। তাদের পিছনে রয়েছে ঘোড়-সোয়ার। অনেক ঘোড়-সোয়ার।

...সিংহদরজা খোলাই ছিল। বিনা বাধায় সদলবলে প্রবেশ করলেন উদয়প্রতাপ। শ্রীহর্ষ বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তাঁর গলায় জবাফুলের মালা, পরিধানে রক্তাম্বর, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। মূর্তিমান অগ্নির মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। চতুর্দোলা থেকে উদয়প্রতাপ নাবলেন। তাঁর বর-বেশ।

শ্রীহর্ষই সম্বর্ধনা করলেন এগিয়ে।

"আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা।"

উদয়প্রতাপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে?"

"আমি পুরোহিত।"

"ও, নমস্কার। আমার সঙ্গেও পুরোহিত আছেন একজন। মহারাণী কোথা?"

"অন্দরমলে আছেন তিনি। আপনারা বসুন। খবর পাঠাচ্ছি তাঁকে। আসুন এই দিকে—"

মন্দিরের সামনেই অতিথিশালা। তারই সুপ্রশস্ত দালানে শতাধিক লোকের বসবার জায়গা নায়েব মশাই ঠিক করে রেখেছিলেন। দামী কার্পেটের উপর সাজানো ছিল শাদা-ওয়াড় পরানো তাকিয়ার সারি। মাঝখানের তাকিয়াটির বৈশিষ্ট্য ছিল

কেবল। সেটিতে ছিল দামী জরি-বসানো মখমলের ওয়াড়। তার সামনেও দামী মখমল পাতা ছিল একটি। দেখলেই মনে হয় বরাসন। উদয়প্রতাপ এরকম সম্বর্ধনা প্রত্যাশা করেননি, বরং ভেবেছিলেন বাধা পাবেন। প্রস্তুতও হয়ে এসেছিলেন সেজন্য। শ্রীহর্ষের আহ্বানে সকলে গিয়ে দালানে আসন গ্রহণ করবার পর উদয়প্রতাপের চতুর্দোলা থেকে প্রকাণ্ড একটি মুখ-বাঁধা পিতলের হাঁড়ি নামিয়ে আনল একজন। উদয়প্রতাপ সেটি তাঁর পাশেই রাখতে বললেন।

"মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে কখন?"—প্রশ্ন করলেন তিনি শ্রীহর্ষকে।

"আমি খবর নিচ্ছি।

শ্রীহর্ষ ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললেন, "মহারাণী আপনার সঙ্গে এখনি আলাপ করবেন। কিন্তু একা আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে চান তিনি।"

"আমিও তাই চাই। কিছু করবার আগে গোটাকতক কথা বলবার আছে তাঁকে।"

"বেশ। আসুন তাহলে সর্বাগ্রে মা-কে প্রণাম করে নিন।"

শ্রীহর্ষ কালীমন্দিরের দরজাটি খুলে দিলেন ভাল ক'রে। কষ্টি-পাথরের কালীমূর্তি, আকারে খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ দর্শনা। উদয়প্রতাপ সদলবলে উঠে এসে প্রণত হলেন সেই মূর্তির সামনে। যে পুরোহিতটি ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি বললেন, "এরকম কালীপ্রতিমা আমি আর দেখিনি কখনও। অদ্ভুত মূর্তি—!"

শ্রীহর্ষ এই ধরণেরই সুযোগ খুঁজছিলেন একটা।

বললেন, "এরকম জাগ্রত কালীও এ অঞ্চলে আর নেই। উনি শুধু প্রস্তর-প্রতিমা নন, প্রয়োজন হ'লে জীবন্তও হ'তে পারেন। একবার একজন লোভী পুরোহিত ওঁর মুকুটের নীলাটি নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, উনি খড়্গাঘাতে স্বহস্তে তাকে বধ করেন—"

"বলেন কি।"

"এ সত্যি কথা, সকলেই জানে।"

প্রণাম-পর্ব শেষ হবার পর শ্রীহর্ষ উদয়প্রতাপকে বললেন, "আপনি আসুন তাহলে—"

আবার সেই ঘরে সেই পরদার সম্মুখে গিয়ে বসলেন উদয়প্রতাপ। দেখলেন মেজের উপর সেই আলপনাটিই আঁকা রয়েছে—বিরাট একটা সাপের সঙ্গে বিরাট একটা ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে।

মহারাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কার। আশা করি পথে কোন কষ্ট হয়নি। আপনার চিঠি পাঠাবার অভিনব পদ্ধতিটি খুব ভালো লেগেছে আমার। সত্যিই আপনি অসাধারণ লোক।"

"শুনে সুখী হলাম। আপনি তো জানেন এই দিনটির জন্যে কতকাল থেকে প্রতীক্ষা ক'রে আছি।"

"আমিও আজ প্রতীক্ষা করছি অনেকক্ষণ থেকে। আশা করেছিলাম সন্ধেবেলাই আপনারা এসে পড়বেন। খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও সেই ভেবেই করেছি, হয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"আসতে কেন দেরী হয়েছে তা শুনলে আপনি হয়তো ক্ষমা করবেন। একটু ঘুরে আসতে হয়েছে। আপনার একটি মহাশত্রু নিপাত ক'রে এসেছি।"

"আমার মহাশত্রু! কে সে?"

"আপনাদের ম্যানেজার কিশোরীমোহন। তিনি কালেক্টার সাহেবকে গিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে আপনার নাকি নানাসাহেবের উপর গভীর সহানুভূতি। আপনি এবং গালুটির জমিদার মহেন্দ্রনাথ না কি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন। হয়তো এজন্য পুলিশ ফৌজ আপনাদের বাড়িতে হানা দেবে।"

"আমাদের ম্যানেজার যে কালেক্‌টার সাহেবকে একথা বলেছেন তা আপনি টের পেলেন কি ক'রে ?"

"রাঘব সিংহ কালেক্‌টার সাহেবের দো-ভাষী। তারই জবানীতে খবরটা কালেক্‌টার সাহেব শুনেছেন। ওই রাঘব সিংহই খবরটা আমাকে দিয়েছিল।"

"তিনি খবরটা আপনাকে দিতে গেলেন কেন ?"

"কারণ আমরা সবাই নানাসাহেবের দলের লোক। নানাসাহেব এই অঞ্চলেই এসেছেন তা সত্যি, ঠিক কোথা আছেন সে খবর অবশ্য এখনও পাইনি, তবে আমাদের দলের লোকেরা চেষ্টা করছে যাতে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নেপাল অঞ্চলে পালিয়ে যেতে পারেন।"

পরদার ওপারে মহারাণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ক্ষণকালের জন্যে সে ভাবলে নানাসাহেবের খবরটা একে বলা সমীচীন হবে কি ? শেষে না বলাটাই ঠিক করল।

"আমাদের ম্যানেজারকে মেরে ফেলেছেন !"

"তার মুণ্ডটা একটা পিতলের হাঁড়িতে পুরে এনেছি আপনাকে উপহার দেব ব'লে। বাইরে আছে সেটা—"

স্তম্ভিত হয়ে গেল মহারাণী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল ছাতবাগানের ঘর থেকে শিব-মন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সহসা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সব। কালভুজঙ্গিনীটা এখনও তো ছাতের উপর রয়েছে। আবার সব পণ্ড ক'রে দেবে নাকি ! এখনই একবার দেখা দরকার সে কি করছে।

"আমি একবার ভিতরে যাচ্ছি। এখুনি আসব আবার। বসুন আপনি—" উদয়প্রতাপের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে মহারাণী দ্রুতপদে চলে গেল ছাত-বাগানে। গিয়ে দেখল রঞ্জাবতী নেই সেখানে। ফৌজ চ'লে যাবার পর সে-ও লুকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে, কেউ টের পায়নি।

হেঁটেই চলে গিয়েছিল সে বাগানবাড়িতে, সেখান থেকে একটা পালকি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল কিশোরীমোহনের বাড়ির উদ্দেশে, তাঁকে সুখবরটা দেবার জন্য। রঞ্জাবতীকে দেখতে না পেয়ে মহারাণী বিস্মিত হ'ল, কিন্তু তখন আর খোঁজাখুঁজি করবার সময় ছিল না। আবার ফিরে এল সে।

বলল, "আপনারা পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব কি?"

"তার আগে আপনার উত্তর চাই, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল কিনা।"

"আমি আপনাকে আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এ-ও আমি জানি শক্তিমানের প্রবল জেদ প্রবল জল-প্রপাতের মতো। তার সামনে দুর্বলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সামান্য খড়-কুটোর মতো ভেসে যায়।"

অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন উদয়প্রতাপ।

"শক্তিমান সমুদ্রবিলাসের প্রবল জেদের সামনে যেমন একদিন ভেসে গিয়েছিলেন বিশ্বদেব শর্মা, মারা গিয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে সূর্যদেব—"

"বিশ্বদেব, সূর্যদেব কে?"

"ইতিহাসটা শুনুন তাহলে। বহুকাল আগে আপনার বাবার জমিদারিতে নিমগাঁয়ে বিশ্বদেব শর্মা নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আপনার তখন জন্ম হয়নি বোধহয়। বিশ্বদেব স্বদেশ-হিতৈষী লোক ছিলেন তাই সিপাহীদের বিদ্রোহ সমর্থন করতেন তিনি। কিন্তু আপনার বাবা সমুদ্রবিলাসের মতি-গতি ছিল ঠিক উলটো। তিনি ছিলেন গভর্নমেণ্টের খয়ের খাঁ। তিনি হুকুম জারি করলেন আমার কোনও প্রজা যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। বিশ্বদেব স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন, সে হুকুম অগ্রাহ্য করলেন। কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহীকে

আশ্রয় দিলেন তিনি নিজের বাড়িতে। ফল কি হ'ল জানেন? সমুদ্রবিলাস তাড়িয়ে দিলেন তাঁকে নিজের জমিদারি থেকে। আপনাদের ওই ম্যানেজার—যাঁর মুণ্ডটা আমি কেটে এনেছি—নিজে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন তাঁর বাড়িতে। শুধু তাই নয় পুলিশ লেলিয়ে দিলেন তাঁর পিছনে। ফৌজের গুলিতে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলে ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল তাঁর চোখের সামনে। নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যে সাহেবরা স্ত্রীলোকদের উপরও গুলি চালাতে ইতস্তত করে না। ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে বিশ্বদেব ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছন্নছাড়া ভিখারীর মতো। যেখানেই যান পুলিশ তাড়া করে। অবশেষে বিন্ধ্যাচলের এক সরাইখানায় শোচনীয় মৃত্যু হ'ল তাঁর। ভিখারীর মতো মারা গেলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় আপনার কাকা পর্বতবিলাস উপস্থিত ছিলেন, তিনি সব জানতেন। বিশ্বদেব মারা গেলেন, কিন্তু বেঁচে রইল তাঁর ছোট ছেলে শঙ্করদেব—"

উদয়প্রতাপ চুপ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহারাণী বলল, "আমার বাবা সত্যিই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তাঁর এ আচরণ সমর্থন করেন না। অথচ আপনিও তো ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন, এতে আশ্চর্য লাগছে একটু। ও ঘটনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক আছে বইকি। আমিই বিশ্বদেবের সেই ছোট ছেলে শঙ্করদেব। উদয়প্রতাপ আমার ছদ্ম নাম।"

"বলেন কি!"

হঠাৎ বাড়ির ছাতটা মাথায় ভেঙে পড়লেও এত চমকে উঠত না মহারাণী। উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন, "বাবা মারা যাবার পর আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল এর প্রতিশোধ নেওয়া, যে জমিদারি থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই জমিদারির

মালিক হওয়া, যে জমিদার তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন তাঁর আদরিনী কন্যাকে আমার দাসী করা। এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমি আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছি। অতি সতর্কভাবে আপনাদের প্রত্যেকটি খবর রেখেছি আমি। শক্তি সংগ্রহ করেছি। তারপর হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেলাম আপনাকে একদিন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর গেলাম আপনার কাকার কাছে। যদি ভদ্রভাবে বিয়েটা হয়ে যায়। আপনার কাকা আমাকে চিনতে পারেননি, আমিও নিজের আসল পরিচয় দিলাম না তাঁকে। উদয়প্রতাপের পরিচয়েই বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তিনি রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু আপনি হলেন না। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লোক আমি নই। দেখলাম শক্তিই প্রয়োগ করতে হবে। আজ ঠিক ক'রে এসেছি, আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরব না—"

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার শক্তির উৎস কি ?"

"এখন আর বলতে আপত্তি নেই। আমি ডাকাতি করি। এতে আমার ধনবল জনবল দুইই হয়েছে। আর তা হয়েছে বলেই আজ আমি লক্ষ্যে পৌঁছেছি।"

মহারাণী চুপ ক'রে রইল।

উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন, "সেবার ভিক্ষা করতে এসেছিলাম, আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার দাবী নিয়ে এসেছি, আশা করি এবার আপনি আর বিমুখ হবেন না। আমি চতুর্দোলা, পুরোহিত, বিয়ের সব আয়োজন নিয়ে এসেছি। ভোরের দিকে বিয়ের লগ্নও আছে একটা। আপনি রাজি হ'লে ভদ্রভাবে বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি আলো আর নহবতের ব্যবস্থা করেছেন দেখে আশা হচ্ছে আপনার মত হয়তো বদলেছে। আপনাদের পুরোহিত মশায় যদি সম্প্রদান করেন তাহলে প্রচলিত প্রথাতেই বিয়ে হবে। আর আপনি যদি তাতে রাজি না হন বাধ্য হয়ে আসুর মত

অবলম্বন করতে হবে আমাকে। এখন কি করবেন আপনিই ঠিক করুন।"

"আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল।"

"বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব সে অনুরোধ।"

"আমাদের পূর্বপুরুষের স্থাপিত মা কালী জাগ্রত দেবতা। বিয়ের আগে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসুন।"

"অনুমতি! পাথরের প্রতিমা অনুমতি দেবেন কি ক'রে?"

"আপনি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে তাঁর অনুমতি চাইবেন। মা যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁর হাতের জবাফুলটি আপনার মাথার উপর পড়বে।"

"বেশ, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ফুল যদি না পড়ে—"

"তাহলে বুঝতে হবে এ বিয়েতে মায়ের সম্মতি নেই। তা সত্ত্বেও আপনি যদি বিয়ে করতে চান, করবেন। ঠাকুর দেবতার উপর আপনার বিশ্বাস আছে আশা করি—"

"খুব আছে। আমরা ডাকাতি করি। কালীই তো আমাদের উপাস্য দেবতা। এসেই প্রথমে আপনার মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাহলে আর দেরি করবেন না, ব্যবস্থা করে ফেলুন, এখনি গিয়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি—"

"আগে আপনার সঙ্গীদের খেয়ে নিতে বলুন। তারপর মন্দিরে ঢুকবেন।"

"আমি কিন্তু খাব না।"

"ওঁরা খেয়ে নিন।"

উদয়প্রতাপ হেসে বললেন, "বরযাত্রীরা আগে খেয়ে নিতে পারে, তাতে দোষ নেই। আচ্ছা, তাহলে সে-ই ব্যবস্থাই করুন। আমি বলে দিচ্ছি ওদের।"

উদয়প্রতাপ বেরিয়ে গেলেন।

জমিরুদ্দিন নহবতে বাগেশ্রী আলাপ করছিল।

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা ভূরি ভোজনান্তে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেউ পান চিবুচ্ছেন কেউ তামাক খাচ্ছেন। মদ গাঁজারও ব্যবস্থা ছিল, তা-ও সেবন করছেন অনেকে। উদয়প্রতাপও রয়েছেন তাদের মধ্যে। বিবাহ হবে না এ সন্দেহ আর কারও মনে নেই। বিনা রক্তপাতে যে এতবড় সম্পত্তিটা উদয়প্রতাপের করতলগত হ'ল এতেই সবাই বেশী খুশি।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন আর একজনকে বলছিলেন, "আর বউটা তো ফাও। সর্দারের ওরকম বউ প্রতি গ্রামে গ্রামে একটা দুটো ক'রে আছে। তা সবসুদ্ধ পঞ্চাশটা হবে। শুনেছি এর মধ্যেই শতখানেক কাচ্চাবাচ্চাও হয়েছে—"

শ্রীহর্ষ এসে প্রবেশ করলেন।

"এবার চলুন তাহলে, অনুমতিটা নিয়ে নিন। আমি সঙ্কল্প ক'রে মায়ের হাতে জবাফুল দিয়ে এসেছি।"

"চলুন।"

শ্রীহর্ষের পিছনে পিছনে উদয়প্রতাপ মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন। একটু ভয় হ'ল তাঁর, মন্দিরের ভিতর সূচীভেদ্য অন্ধকার।

"ভিতরে এত অন্ধকার কেন ?"

"অন্ধকারেই অনুমতি নেওয়া নিয়ম। মা কালী যে অন্ধকারেরই দেবতা—"

উদয়প্রতাপকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দিয়ে কপাটটি বন্ধ করে দিলেন শ্রীহর্ষ। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন বদ্ধদ্বারের সামনে।

এর একটু পরেই আর্তনাদটা শোনা গেল। কিন্তু একবার মাত্র। শ্রীহর্ষ কপাট খুলে আলো জ্বেলে দিলেন। তারপরই চীৎকার ক'রে উ লেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে—"

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে উঠল অনেকে। তারা সবিস্ময়ে

দেখল কালীর প্রস্তর-প্রতিমা অন্তর্হিত হয়েছে, তার স্থানে দাঁড়িয়ে আছে জীবন্ত কালীমূর্তি, উত্থিত দক্ষিণ হস্তে রক্তাক্ত খড়গ, উদয়প্রতাপের ছিন্নমুণ্ড বাম হাতে তুলে ধ'রে অট্টহাস্য করছে।

চমৎকার অভিনয় করেছিল কষ্টি।

শ্রীহর্ষ দুহাত তুলে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, "আপনারা যদি বাঁচতে চান পালান। মা আজ রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছেন, পালান, পালান আপনারা। এ স্থান ত্যাগ করুন অবিলম্বে—"

এর পরই সিংহের গর্জন শোনা গেল।

পরমূহূর্তেই সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে মহারাজের পিঠে চ'ড়ে বেরুল মহারাণী, মাথায় মুকুট, হাতে বল্লম।

আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন শ্রীহর্ষ, "এ কি, মা জগদ্ধাত্রীও যে জীবন্ত হয়েছেন দেখছি, আজ আর কারো রক্ষা নেই, সবাই মরবে আজ।"

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিল অনেকে। তাদের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চেয়ে আর একবার গর্জন ক'রে উঠল মহারাজ। তারপর একলম্ফে সিংহ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পালাতে লাগল উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিশালা খালি হয়ে গেল।

স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীহর্ষ।

কষ্টি আগেই পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। শ্রীহর্ষ পিছনের বারান্দা থেকে প্রস্তর প্রতিমাটিকে এনে আবার স্বস্থানে স্থাপন করলেন।

ছয়

শ্রীহর্ষ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় ভোর, কিন্তু অন্ধকার তখনও কাটেনি। টোলের ছুটি ছিল, ছাত্রেরা বাড়ি চলে গিয়েছিল আগের দিনই। যে চাকরটার বাইরে শোবার কথা দেখলেন সে নেই। তার সাড়া পেলেন না।

"সর্বমঙ্গলা—"

একটা কাল-পেঁচা বিকট চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল।

"সর্বমঙ্গলা—"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শ্রীহর্ষের মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। হঠাৎ নজরে পড়ল পাল্কিটা বাইরে পড়ে আছে, বেয়ারাগুলো নেই।

"সর্বমঙ্গলা—"

বারান্দায় উঠে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবেন এমন সময় কিসে যেন হোঁচট্ খেলেন। দরজার সামনে শুয়েছে কে? অন্ধকারে বুঝতে পারলেন না কিছু?

"কে এখানে শুয়ে—"

কোন সাড়া নেই। তখন ভয় হ'ল। নানাসাহেবের কিছু হয়নি তো! সর্বমঙ্গলা কোথা! হাতড়ে দেশলাই খুঁজে আলো জ্বাললেন একটা। জ্বেলে যা দেখলেন তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল তাঁর।

কপাটের সামনে সর্বমঙ্গলার রক্তাক্ত মৃতদেহটা প'ড়ে আছে।

পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তার। প্রাণ থাকতে সে পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু নানাসাহেবকে ধরতে পারেনি তারা। পাতাল-ঘরটাই আবিষ্কার

করতে পারেনি। নানাসাহেব যথাসময়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে নদীতীরের বটবৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শ্রীহর্ষ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এতক্ষণ দেবতাকে নিয়ে যে মিথ্যা অভিনয় করলাম, হাতে হাতে তারই শাস্তি দিলেন ভগবান।

সাত

মহারাজ মহারাণীকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগল।

মহারাণীর ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে সোজা শ্রীহর্ষের বাড়ির দিকে চ'লে যাবেন। মহারাজ কিন্তু কিছুতেই সে রাস্তায় গেল না। স্বাধীনতা পেয়ে সে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল। মহারাণীর হাত থেকে বল্লমটা পড়ে গেল, সেটা আর মহারাণী কুড়িয়ে নিতে পারল না, এত জোরে ছুটছিল মহারাজ। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল সে। মাঠে বেরিয়ে তার গতিবেগ এত বেড়ে গেল যে তার পিঠে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল মহারাণীর পক্ষে। তবু সে বসে রইল। দুহাতে মহারাজের গলা ধ'রে তার কেশরে মুখ গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে রইল তাকে। তার মনে হ'তে লাগল এখন মহারাজই তার জীবনের একমাত্র সম্বল, তাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। চোখ বুজে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল তাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল মহারাজ। মহারাণীর মাথার মুকুটটাও খুলে পড়ে গেল। মহারাণীর খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ ঢুকে পড়ল একটা অড়রের ক্ষেতে। তার ভিতরেও ছুটতে লাগল সে। মহারাণীর গা ছ'ড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল।

"থাম একটু—কি করছিস—"

মহারাজ কিন্তু থামল না। ছাড়া পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে। অড়র ক্ষেত পার হয়েই ছিল একটা নালা। মহারাজ একলাফে পার হয়ে গেল নালাটা, মহারাণী পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। নালাতে জল খুব বেশী ছিল না, কাদাই ছিল বেশী। কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেল মহারাণীর সর্বাঙ্গ। তবু নালা পেরিয়ে মহারাণী

ওপারে গিয়ে উঠল, দেখল সামনের বিস্তৃত মাঠ ভেঙে মহারাজ

"ফিরে আয়, মহারাজ, ফিরে আয় বলছি—"

মহারাজ কিন্তু ফিরল না, দেখতে দেখতে মাঠটা পার হয়ে গেল সে। মাঠের ওপারে একটা জঙ্গল ছিল, তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল মহারাণী, "মহারাজ, তুইও আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলি—"

কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল।

মহারাজ কিন্তু তাকে ফেলে পালায়নি। ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে সে ছুটছিল, লাফাচ্ছিল, কিন্তু মহারাণীকে ফেলে পালাবার কথা মনেও হয়নি তার। বনের ভিতর ঢুকে মহারাণীর জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল, প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগল মহারাণী আসবে, ছুটতে ছুটতে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে তার পিঠে। অনেকক্ষণ আশা ক'রে বসে রইল সে, কিন্তু মহারাণী আর ফিরল না। বাগান থেকে তখন সন্তর্পণে বেরুল মহারাজ। মাঠে বেরিয়ে মহারাণী যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেই দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর ডাকল একবার। মহারাণী এল না। তবু ব'সে রইল সে। ....একটু দূরে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুজন অশ্বারোহী সাহেব। তারা খরগোশ শিকার করতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ সিংহের সম্মুখীন হতে হবে ভাবেনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। পরমুহূর্তেই গর্জন করে উঠল তাদের বন্দুক। রক্তাক্ত দেহে মহারাজ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মহারাণীর সঙ্গে আর তার দেখা হ'ল না।

রাত্রির অন্ধকার নেমেছে চারদিকে।

সর্বমঙ্গলার শেষকৃত্য সমাপন ক'রে শ্রীহর্ষ একা বসে আছেন

বারান্দায়। অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনিতে স্পন্দিত হচ্ছে অন্ধকার শ্রীহর্ষ ভাবছেন দ্রুত লয়ে কি অদ্ভুত ঘটনা-পরম্পরা ঘটে গেল একদিনের মধ্যে। সমস্ত জীবনটাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আবার যেন সব নূতন করে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কি? মহারাণী বাল্যকাল থেকে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। সে-ও কোথা চলে গেল। বাকী জীবনটা একাই কাটাতে হবে? ছাত্র আর টোল নিয়ে? কত কথা মনে হচ্ছিল তাঁর।

মহেন্দ্রনাথও নেই। সকালে তাঁকে খবর দিতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন তিনি নিরুদ্দিষ্টা বেদানার খোঁজে বেরিয়েছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই। তাঁর ম্যানেজার এসে সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসে প্রথমেই পুলিশে খবর দিলেন। দারোগা এসে রিপোর্টে লিখলেন—"মহারাণী চৌধুরাণীর বাড়িতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতদের সঙ্গে মহারাণীর বরকন্দাজের সংঘর্ষের ফলে ডাকাতের সর্দার উদয়প্রতাপ মারা গেছে। উদয়প্রতাপ সঙ্গে করে একটা পিতলের হাঁড়ি নিয়ে এসেছিল। তার ভিতর ম্যানেজার কিশোরীমোহনের ছিন্ন মুণ্ড পাওয়া গেছে। কিশোরীমোহনকে আগেই খুন করেছিল তারা তার বাড়িতে গিয়ে, মুণ্ডটা নিয়ে এসেছিল সম্ভবত মহারাণীকে ভয় দেখাবার জন্য। কিশোরীমোহনের বাড়িতে তাঁর ধরটা পাওয়া গেছে।" রিপোর্টে দারোগা সাহেব এ সন্দেহও প্রকাশ করলেন যে মহারাণীকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন সম্ভবত ডাকাতরাই তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে। তার খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠানো হয়েছে।

এদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছিল। শ্রীহর্ষের বাড়িতে নানাসাহেবকে না পেয়ে ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন ভাবলেন কিশোরীমোহন লোকটি ধূর্ত এবং পাজি। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ ক'রে কিশোরীমোহন ইচ্ছে ক'রে পুলিশবাহিনীকে বিপথে চালিত করেছে

এবং অন্যদিক দিয়ে হয়তো নানাসাহেবকে পালাতে সাহায্য করেছে।
শ্রীহর্ষের বাড়ি থেকে তাই তাঁরা সোজা হানা দিয়েছিলেন কিশোরী-মোহনের বাড়িতে। সেখানে কিশোরীমোহনকে তাঁরা পাননি। রঞ্জাবতীকে পেয়েছিলেন, তাকেই ধরে নিয়ে গেছেন। মুণ্ডহীন লাসের কাছে রঞ্জাবতীকে দেখে তাদের আরও সন্দেহ হয়েছিল যে মেয়েটি শয়তানী।

শ্রীহর্ষ ভাবছিলেন। মহারাণীর খোঁজে যারা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে একজনও ফেরেনি এখনও।

হঠাৎ শ্রীহর্ষ চমকে উঠলেন।

উঠোনের অন্ধকারে আবছা-মূর্তি দেখা যাচ্ছে কার।

"কে ?"

আলোটা কমানো ছিল একধারে, সেটাকে বাড়িয়ে দিলেন।

"এ কি মহারাণী! এ কি চেহারা তোমার—"

মহারাণীকে ভিখারীর মতো দেখাচ্ছিল।

"কোথা ছিলে সমস্ত দিন—"

মহারাণী কোন কথা না বলে এগিয়ে এল ধীরে ধীরে, তারপর শ্রীহর্ষের পায়ের উপর মাথা রেখে পা দুটো জড়িয়ে ধরল তার

॥ সমাপ্ত ॥



